এই ভুবনের ভার

প্রফুল্ল রায়

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট / কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ

জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০

প্রকাশক

সমীরকুমার নাথ

নাথ পাবলিশিং হাউস

২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস

কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট

গৌতম রায়

মুদ্রক

মথুরামোহন দত্ত

মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস

৭০ ডবলু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০০০৬

এই ভুবনের ভার

খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস হিরণ্ময়ের। জানালার কাচে বা ভেন্টিলেটরের ফাঁকে আলোর একটু আভা দেখলে তিনি আর শুয়ে থাকতে পারেন না। পাঁচ দিন আগে সবাইকে নিয়ে পঁচিশ বছর বাদে কলকাতায় চলে এসেছেন। অভ্যাসটা তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি।

অন্যাদিনের মতো আজও আবছা অন্ধকার থাকতে থাকতেই ঘুম ভাঙে হিরণ্ময়ের। পাশে রমলা হাঁটু সামান্য মুড়ে কাত হয়ে ঘুমোচ্ছেন। ধীরে ধীরে তাঁর নিশ্বাস পড়ছে। একপলক স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে খাট থেকে নিচে নামেন হিরণ্ময়, তারপর দরজা খুলে বাইরে চলে যান।

ওল্ড বালিগঞ্জের অনেকখানি জায়গার মাঝখানে মাঝারি মাপের ছিমছাম এই পৈতৃক বাড়িটার একতলায় কিচেন, ড্রইংরুম, খাওয়ার ঘর, কাজের লোকেদের থাকার ব্যবস্থা, গ্যারাজ ইত্যাদি। দোতলায় মোট পাঁচখানা ঘর। একটা তাঁর আর রমলার, একটা পলার, একটা টিপুর, একটায় তাঁর স্টাডি, বাকি ঘরটা গেস্টদের জন্য সংরক্ষিত।

দোতলার সবগুলো ঘরের সামনে দিয়ে গ্রিল দেওয়া চওড়া বারান্দা চলে গেছে।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে টিপু আর পলার ঘরের দিকে একবার তাকান হিরণ্ময়। তাঁর দুই ছেলেমেয়েই ভীষণ ঘুমকাতুরে, এদিক থেকে মায়ের স্বভাবটা ওরা পুরোপুরিই পেয়েছে। সাতটা সাড়ে সাতটার আগে কেউ বিছানা ছাড়ে না।

নিজের পড়ার ঘরে চলে আসেন হিরণ্ময়। দিল্লী থেকে ট্রাকে বোঝাই করে বই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তার সামান্যই গুছিয়ে রাখা হয়েছে। বেশির ভাগ বই বড় বড় প্যাকিং বাক্সের ভেতর রয়েছে। সেগুলো বার করে সাজাতে সময় লাগবে।

ঘরের মাঝখানে বড় গ্লাস-টপ টেবলের একধারে গদিমোড়া রিভলভিং চেয়ার। সেটার সামনেও ভিজিটরদের জন্য খানকয়েক চেয়ার, তবে সেগুলো রিভলভিং নয়। এ ছাড়া রয়েছে ডিভান, সোফা, সেন্টার টেবল, ইত্যাদি।

প্রকাণ্ড দেওয়াল-জোড়া জানালার পাশে একটা সোফায় বসে পড়েন হিরণ্ময়।

তেইশ বছর পর তিনি কলকাতায় এসেছেন। এর মধ্যে শহরটা আরো ঘিঞ্জি, আরো নোংরা, আরো জঘন্য হয়ে গেছে। কিন্তু এই অঞ্চলটা বিশেষ পালটায়নি। তাঁদের কমপাউণ্ডের ভেতর চারপাশের ফাঁকা জায়গায় ফুলের বাগান। বাড়ির বাইরে যেদিকে তাকানো যাক, এখনও প্রচুর গাছপালা চোখে পড়ে।

বাড়িটার সামনের দিকে বিরাট পার্ক, ডান পাশে এবং বাঁ পাশে চওড়া রাস্তা। এই তিনটে দিক কোনোদিনই বন্ধ হবার সম্ভাবনা নেই। অবশ্য পেছনে অগুনতি ঘরবাড়ি চোখে পড়ে, তার মধ্যে বেশ কিছু হাই-রাইজ। সব মিলিয়ে পরিবেশটা এখনও খোলা-মেলাই রয়েছে। কলকাতায় যা পলিউশান, সেই তুলনায় বাতাস এখানে অনেক পরিষ্কার, ধোঁয়ায়-ধুলোয় বিষাক্ত হয়ে নেই।

মেরুদণ্ড টান টান করে পুব আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন হিরণ্ময়। সূর্য যতক্ষণ না উঠছে এইভাবেই বসে থাকবেন। ছেলেবেলায় এই অভ্যাসটা করিয়েছিলেন তাঁর বাবা। হিরণ্ময়ের আক্ষেপ, হাজার চেষ্টা করেও নিজের ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীকে একটা দিনও তিনি ভোরে ওঠাতে পারেননি। সূর্যোদয়টা মানুষের জীবনে কত বড় ব্যাপার সেটা ওরা কোনোদিনই জানতে পারল না।

সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে এল। বাংলা ক্যালেণ্ডারে এখন আশ্বিন মাস অর্থাৎ শরৎকাল। কলকাতা যত কুৎসিতই হোক, জঞ্জালে চারিদিক যতই ভরে থাক, এই সময়টায় এখানকার আকাশে বাতাসে কী এক ম্যাজিক যেন থাকে।

হিরণ্ময় যেখানে বসে আছেন সেখান থেকে যতদূর চোখ যায় আকাশ ঝকঝকে নীল। মাঝে মাঝে ভারহীন ধবধবে মেঘ ফুরফুরে মেজাজে ভেসে বেড়াচ্ছে। ঝিরঝির করে অদৃশ্য স্রোতের

ভতো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। না ঠাণ্ডা, না গরম—এই সময়টা বড়ই সুখকর।

রোদ ওঠেনি, তবে আলো ফুটতে শুরু করেছে। চারপাশের গাছপালার মাথায় অজস্র পাখি উড়তে উড়তে সমানে ডাকাডাকি করে যাচ্ছে। পার্কের ধার ঘেঁষে ছেঁড়া তেরপলের তলায় চায়ের দোকান। সেখানে ছোটখাটো একটা ভিড় জমেছে। খবরের কাগজওলাদের এখনও দেখা নেই, তবে দু-একটা দুধের গাড়ি সাঁ সাঁ করে সামনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কলকাতার স্কাই-লাইনের ওপর সূর্য যতক্ষণ না উঠে আসছে ততক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকবেন হিরণ্ময়। কিন্তু আজ আর তা সম্ভব হলো না। সূর্য যখন আধখানা সার্কেলের মতো অনেক দূরে মাথা তুলেছে সেই সময় ফোন বেজে উঠল।

দিল্লীতে থাকতেই এ বাড়ির ফোনের ব্যবস্থা করে এসেছিলেন হিরণ্ময়। তিনি বিখ্যাত মানুষ। তাঁর যা যোগাযোগ এবং ইনফ্লুয়েন্স তাতে দিল্লী থেকে এখানকার টেলিফোন অফিসকে জানাতেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ হয়ে গেছে। ওল্ড বালিগঞ্জে পা দিয়েই তিনি দেখতে পান ফোন বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তিনি যে দিল্লী ছেড়ে স্থায়ীভাবে কলকাতায় থাকতে এসেছেন, জীবনের শেষ বছরগুলো নিজের শহরেই কাটিয়ে দেবেন এটা কলকাতার কাগজের লোকদের জানিয়ে দিয়েছেন। খবরটা তারা বার করেছে। সেই সঙ্গে এ বাড়ির ঠিকানা আর ফোন নম্বরও ছেপেছে।

কিন্তু এত ভোরে কে ফোন করতে পারে? একটু বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে মাঝখানের টেবলটার একধারে টেলিফোনটার দিকে তাকান হিরণ্ময়। ওটা কুরুর কুরুর করে একটানা বেজেই যাচ্ছে।

অগত্যা উঠতেই হয়। নিতান্ত অনিচ্ছায় ফোনটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে একটা গলা ভেসে আসে, 'এটা কী ডাবল ফোর সেভেন টু…' কণ্ঠস্বরটি কোনো কমবয়সী মেয়ের, সেটা ভীষণ কাঁপছে।

আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের বাড়ির মেয়েদের গলা মনে করার

চেষ্টা করলেন হিরণ্ময়। কিন্তু না, তারা কেউ নয়। স্বরটি সম্পূর্ণ অচেনা। বেশ অবাক হয়েই তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, নাম্বার ঠিক আছে। কাকে চান?'

'হিরণ্ময় সান্যালকে। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। ভীষণ দরকার।'

'কী দরকার?'

'সেটা ওঁকে ছাড়া বলা যাবে না। দয়া করে হিরণ্ময়বাবুকে লাইনটা দিন—'

একটু ইতস্তত করেন হিরণ্ময়। ভোরবেলায় এই উৎপাত তাঁর ভাল লাগছিল না। একবার ভাবেন লাইনটা কেটে দেবেন। কিন্তু মেয়েটার বলার ভঙ্গিতে যে ব্যাকুলতা রয়েছে সেটা তাঁকে কৌতূহলী করে তোলে। দ্বিধান্বিতভাবে বলেন, 'আমিই হিরণ্ময়। যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর শোনা যায়, 'আপনাকে বিরক্ত করছি। না করে উপায় ছিল না। আমার আর সমীরের ভীষণ বিপদ। আপনি আমাদের বাঁচান।'

গলার স্বরটি এবার খুব চাপা। মেয়েটিকে দেখা না গেলেও সে যে খুবই আতঙ্কগ্রস্ত সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে। হিরণ্ময় চকিত হয়ে ওঠেন, 'আপনি কে?'

'আমি মল্লি—'

'ঠিক চিনতে পারলাম না তো।'

ওধার থেকে উত্তর নেই।

লাইনটা কেটে গেল কিনা, বুঝতে না পেরে হিরণ্ময় বলতে থাকেন, 'হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো—'

প্রায় আধ মিনিট বাদে আবার গলাটা শোনা যায়, 'নিজের পরিচয় দিতে সাহস হচ্ছে না।'

'কেন?'

'আমি—আমি—' বলতে বলতে থেমে যায় মেয়েটি।

'পরিচয় না দিলে আমি আর কিছু শুনব না।' কিছুটা রুক্ষ গলায় হিরণ্ময় বলেন, 'এই ফোন নামিয়ে রাখছি।'

ব্যগ্র গলায় মেয়েটি এবার বলে, 'দয়া করে ডিসকানেক্ট করবেন

না। অনেক কষ্টে আপনাকে পেয়েছি।' একটু থেমে মরিয়া হয়েই যেন বলে, 'আমি—আমি আপনার মেয়ে।'

এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না হিরন্ময়। স্নায়ুমণ্ডলীতে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা অনুভব করেন তিনি। তারপর যে প্রতিক্রিয়াটি হয় তা এইরকম। মেয়েটি কী তাঁর সঙ্গে তামাসা করছে? না, তার অন্য কোনো অভিসন্ধি রয়েছে? হিরন্ময়ের এক ছেলে এক মেয়ে। হঠাৎ আরেকটি মেয়ে এল কোত্থেকে? যে ফোন করছে সে কি তাঁকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়?

হিরন্ময় অত্যন্ত ধীর স্থির মানুষ, খুব সহজে উত্তেজিত বা বিচলিত হন না। মেয়েটি তার নাম বলেছে মল্লি, তার সঠিক পরিচয়টা আগে সুকৌশলে ঠাণ্ডা মাথায় জেনে নিতে হবে। তেমন দরকার হলে ব্যাপারটা পুলিশকে জানাবেন।

শান্ত গলায় হিরন্ময় বলেন, 'আমার মেয়ে—ঠিক বুঝলাম না তো।'

'আমার কথা হয়তো আপনার মনে নেই। মায়ের নাম বললে নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন।'

'কে তোমার মা?'

'বিজলী—বিজলীপ্রভা।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভেতর যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে যায়। হিরন্ময় প্রায় চেঁচিয়েই ওঠেন, 'তুমি কোত্থেকে ফোন করছ?'

'আমি—'

কথাটা আর শেষ করতে পারে না মল্লি। হঠাৎ ফোনে একটা পুরুষের গলা ভেসে আসে কিন্তু সেটা এতই অস্পষ্ট যে কিছু বোঝা যায় না। তবে মনে হয় লোকটা মল্লিকে শাসাচ্ছে। তারপরেই খুট করে একটা শব্দ হয়।

অস্থিরভাবে হিরন্ময় সমানে বলতে থাকেন, 'হ্যালো মল্লি—হ্যালো—হ্যালো—হ্যালো—'

ওধার থেকে কোনো সাড়া নেই। লাইন কেটে গেছে।

ফোনটা আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে ফের সেই সোফাটিতে এসে বসেন হিরন্ময়। এর মধ্যে সূর্য আরো খানিকটা উঠে এসেছে।

নিচের দিকের আরো একটু বেরিয়ে এলেই সার্কেলটা পুরো হয়ে যাবে।

কিন্তু সূর্যের দিকে আজ আর নজর নেই হিরণ্ময়ের। মল্লির ফোনটা তাঁকে আমূল নাড়া দিয়ে গেছে।

বিজলীর নামটা দীর্ঘ তেইশ-চব্বিশ বছর বাদে আবার শুনতে পাবেন, কে ভাবতে পেরেছিল। বিজলীর যে ছোট্ট একটি মেয়ে ছিল, যার নাম মল্লি, তাকে তো ভুলেই গিয়েছিলেন হিরণ্ময়। নিজের জীবনের ক্রমাগত সাফল্য, খ্যাতি এবং বিপুল প্রতিষ্ঠা ওদের দু'জনকে দূরে, আরো দূরে—গভীর বিস্মৃতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আসলে ওদের কথা তিনি মনে রাখতেই চাননি।

কত বছর কেটে গেছে কিন্তু বিজলীর নাম শোনামাত্র এখনও তাঁর গোটা অস্তিত্ব রি রি করতে থাকে। এমন নষ্ট দুশ্চরিত্র মেয়েমানুষ তিনি আর একটিও দেখেননি। হিরণ্ময় তাকে ঘৃণা করেন—প্রচণ্ড ঘৃণা। কিন্তু মল্লি? তার সম্বন্ধে তাঁর অনেক দায়-দায়িত্ব ছিল। বিজলীর প্রতি প্রবল বিদ্বেষে তিনি তার কিছুই পালন করেননি।

মল্লি জানিয়েছে সে এবং সমীর নামে কে একজন ভীষণ বিপন্ন। কী ধরনের বিপদ হতে পারে ওদের? সেটা জানা যায়নি। যেমন জানা যায়নি, মল্লি কোত্থেকে ফোন করছিল কিংবা সমীর কে, আর যে লোকটা চাপা গলায় হুমকি দিচ্ছিল তার পরিচয়ই বা কি? মল্লিকে কি কোথাও আটকে রাখা হয়েছে?

তেইশ বছর আগে বিজলীর সঙ্গে যখন সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় তখন মল্লির বয়স ছিল তিন। এখন সে ছাব্বিশ বছরের পরিপূর্ণ তরুণী। হঠাৎ এই মেয়েটার প্রতি আশ্চর্য এক টান অনুভব করেন হিরণ্ময়—রক্তের টান। কিন্তু মল্লিকে যে বিপদ থেকে বাঁচাবেন, সেটা কিভাবে? তিনি তো জানেনই না সে এখন কোথায়। অত্যন্ত বিপজ্জনক এক রহস্যের সামান্য একটু আভাস দিয়েই মল্লিকার লাইন কেটে গিয়েছিল। নাকি জোর করে তাকে থামিয়ে দেওয়া হয়? মনে হচ্ছে তা-ই।

সীতা একটা ট্রে-তে করে টী-পট, মিল্ক পট, সুগার কিউব বোঝাই পোর্সিলেনের পাত্র, শৌখিন চায়ের কাপ এবং নানা ধরনের

বিস্কুট একটা প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে আসে। মাঝবয়সী সীতা হিরন্ময়দের রান্নাবান্না করে। অনেক দিন তাঁদের কাছে আছে, একরকম ফ্যামিলি মেম্বারই হয়ে গেছে।

সোফার পাশের একটা নিচু টেবলে ট্রে নামিয়ে রেখে চলে যায় সীতা। প্রতিদিন নিঃশব্দে এসে এভাবে চা দিয়ে যায় সে।

একষট্টি চলছে হিরন্ময়ের। বছর তিনেক আগে মাঝারি ধরনের একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। নইলে আর কোনো শারীরিক উৎপাত নেই। নো ব্লাড সুগার, নো প্রেসার ট্রাবল, নো গ্যাসট্রিক প্রবলেম। রাত্তিরে ঘুমটাও ভালই হয়।

অন্যের তৈরি চা পছন্দ নয় হিরন্ময়ের। অন্যমনস্কর মতো কাপে চায়ের লিকার এবং দুধ ঢেলে একটা সুগার কিউব ফেলে চামচ দিয়ে নাড়তে থাকেন। একসময় কাপটা তুলে চুমুক দিতে দিতে ঘাড় ফিরিয়ে একবার ফোনটা দেখেন। মল্লি কি আবার যোগাযোগের চেষ্টা করবে? কিন্তু যে লোকটা তখন শাসাল সে কি আর তাকে সেই সুযোগ দেবে?

হিরন্ময়কে এখন দেখলে বোঝা যাবে তাঁর মধ্যে ভয়ংকর অস্থিরতা চলছে। কিভাবে মল্লিকে খুঁজে বার করবেন, একেবারেই ভেবে পাচ্ছেন না।

ফোনটার দিকে তাকিয়ে পর পর দু কাপ চা খান হিরন্ময়। কিন্তু সেটা বেজে ওঠার লক্ষণ নেই। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো চেতলার ব্রজরাখাল চক্রবর্তীর মুখটা চোখের সামনের কোনো এক অদৃশ্য পর্দায় ফুটে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র উত্তেজনা রক্তের ভেতর দিয়ে সমস্ত শরীরে ঝড়ের বেগে বয়ে যায়। আর অদৃশ্য কোনো আবেগ হিরন্ময়কে এক টানে সোফা থেকে তুলে দাঁড় করিয়ে দেয়। এখনই, এই মুহূর্তে তাঁকে চেতলায় যেতে হবে।

দুই

পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে হিরণ্ময়ের চোখে পড়ে টিপু, পলা ও রমলা এখনও ঘুমোচ্ছে। ডান ধারের দেওয়ালে ইলেকট্রনিক ওয়াল ক্লকটায় ছ'টা বেজে পঁয়ত্রিশ। সাড়ে সাতটার আগে ওদের ঘুম ভাঙবে না। ওদের তুলে চেতলায় যাবার খবরটা যে দেবেন তার উপায় নেই। তিনি চলেছেন নিজের জীবনের এক টুকরো খোয়ানো অতীতের সন্ধানে। এটা জানাজানি হলে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে ছাড়বে।

একরকম পা টিপে টিপে একতলায় নেমে আসেন হিরণ্ময়। কাজের লোকেদের যে ঘুম ভেঙেছে সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে। তবে তারা নিজের নিজের ঘরেই রয়েছে, বাইরে বেরোয়নি। সীতা কিচেনে খুটখাট করে কী যেন করছে তার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

হাঁটাহাঁটির অভ্যাস একেবারেই নেই হিরণ্ময়ের। কোথাও বেরুলে গাড়িতেই যান। কিন্তু গাড়ি বার করতে গেলে আওয়াজে কাজের লোকেরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে। তিনি চান না কেউ তাঁকে দেখে ফেলুক। তাহলে হঠাৎ এভাবে বেরুনোর কৈফিয়ত দিতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত খবরটা রমলাদের কাছেও পেঁৗছে যাবে।

সামনের বাগানের ধার ঘেঁষে নুড়ির পথ। তার ওপর দিয়ে চুপিসারে লোহার বিরাট গেটটার কাছে এসে খুব আলতো করে সেটা খুলে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে আসেন হিরণ্ময়। এমনিতে তিনি ঢিলেঢালা অন্যমনস্ক ধরনের মানুষ। হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় ব্যস্তভাবে পকেটে হাত দিয়ে টের পান, নাঃ, পার্সটা রয়েছে। নইলে আজ আর হয়তো চেতলায় যাওয়া হতো না। ওল্ড বালিগঞ্জ থেকে এতটা রাস্তা হেঁটে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব না। পার্সটা না থাকলে বাড়িতে ফিরে গিয়ে কিছু টাকা আনতে গেলে সেটা

খুব ঝুঁকির ব্যাপার হতো। তখন কেউ যে তাঁকে দেখে ফেলত না, এখন গ্যারান্টি নেই।

রোদ উঠে গেছে, রাস্তায় লোকজন এবং গাড়িটাড়িও বেশ চোখে পড়ছে তবে ভিড়টিড় তেমন নেই। খবরের কাগজওলারা ছাড়া কারুর খুব একটা ব্যস্ততাও চোখে পড়ছে না। সাইকেলে বসেই তুখোড় জাগলারের মতো আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় ওরা দড়ি-বাঁধা পাকানো খবরের কাগজ রাস্তার দু'ধারের দোতলা তেতলা কি চারতলার ব্যালকনিতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। নিশানা নির্ভুল, একটা কাগজও টার্গেটের বাইরে পড়ছে না। কত বছর প্র্যাকটিস করলে এভাবে লক্ষ্যভেদ করা যায়, কে জানে।

এ রাস্তাটা কিভাবে যেন এখনও অক্ষত রয়েছে। গর্ত নেই, ফুটপাথ হকারদের কাছে বেদখল হয়ে যায়নি, দু'পাশে সারিবদ্ধ সোনাঝুরি গাছ।

শরৎকালের ভিড়হীন পরিষ্কার সকালে হাঁটতে ভাল লাগার কথা কিন্তু ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড টেনসান চলছে হিরণ্ময়ের। টেনসানের সঙ্গে অনিশ্চয়তা, অস্বস্তি, হয়তো বা এক ধরনের ভয়ও। তেইশ বছর পর তিনি চলেছেন চেতলায় রাখাল আড্ডি রোডে। কিন্তু ব্রজরাখাল কি এখনও বেঁচে আছেন? মৃত্যু ঘটে না থাকলে তাঁর বয়স এখন হবে আশির ওপর। এতকাল বাদে হিরণ্ময়কে দেখলে কেমন প্রতিক্রিয়া হবে তাঁর? প্রতিক্রিয়া যেমনই হোক, একটা কথা ভেবে সামান্য থতিয়ে যান হিরণ্ময়। বিজলী যা কাণ্ড করে গেছে তাতে ব্রজরাখাল তার সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক রেখেছেন বলে মনে হয় না। বিজলীর জন্য চুন-কালি শুধু হিরণ্ময়ের মুখেই লাগেনি, ব্রজরাখালেরও লেগেছিল।

হিরণ্ময় ভাবেন, জীবনের শেষ মাথায় পেঁছে বিজলীর ওপর ব্রজরাখালের ক্রোধ এবং উত্তাপ হয়তো জুড়িয়ে গিয়ে থাকবে। হয়তো ছিঁড়ে-যাওয়া সম্পর্ক নতুন করে জোড়া লেগেছে। তাহলে ওদের খবর পেতে অসুবিধা হবে না। আর যদি ব্রজরাখাল মারা গিয়ে থাকেন? তাহলে কোথায় কার কাছে মল্লিদের খোঁজ পাওয়া যাবে?

উৎকণ্ঠিতের মতো হাঁটতে হাঁটতে এক সময় ট্রাম রাস্তায় চলে

আসেন হিরণ্ময়। রাস্তাটা ডাইনে পার্ক সার্কাস আর বাঁয়ে গড়িয়া-হাটের দিকে চলে গেছে।

মোড়ের মাথায় তিন চারটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। একটায় উঠে হিরণ্ময় বলে, 'চেতলায় চলুন।'

গড়িয়াহাটার দিকে খানিকটা এগিয়ে ডাইনে ঘুরে হাজরা মোড়। তারপর ল্যান্সডাউন, রাসবিহারী হয়ে কেওড়াতলা বাঁয়ে রেখে আদি গঙ্গার ব্রিজ পেরিয়ে চেতলা।

কলকাতায় এই অঞ্চলটার রাস্তাঘাট, অলিগলি—সমস্ত কিছুই নিজের হাতের রেখার মতোই হিরণ্ময়ের পরিচিত। এখানেই তাঁর জন্ম। জীবনের প্রথম অনেকগুলো বছর চেতলাতেই কাটিয়ে গেছেন।

তাঁর ছেলেবেলায় কী নিরিবিলিই না ছিল জায়গাটা! লোক-জন তখন খুবই কম, চারপাশে প্রচুর ফাঁকা মাঠ, অজস্র গাছগাছালি, পাখি আর পুকুর। এই ক'বছরে কলকাতার অন্য সব এলাকার মতো চেতলাও যথেষ্ট বদলে গেছে। ব্রিজের পর সেন্ট্রাল রোডটা অনেক চওড়া হয়েছে। ফাঁকা জায়গা নেই বললেই হয়। যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, শুধু কংক্রিটের স্ট্রাকচার, তার বেশির ভাগই হাই-রাইজ বিল্ডিং।

সোজা রাস্তা ধরে ট্যাক্সি আরো খানিকটা যাবার পর বাঁ দিকে পার্ক, মার্কেট, থিয়েটার হল ইত্যাদি। পার্কটা আগেও ছিল। তবে মার্কেট কমপ্লেক্স আর থিয়েটার হলটা নতুন। এ সব পার হয়ে হিরণ্ময় বলেন, 'গাড়ি থামান।'

হিরণ্ময়কে রাস্তার ওধারের গলিটায় যেতে হবে। ওটাই রাখাল আড্ডি রোড। বড় রাস্তাতেই তিনি ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলেন।

সময়ের সঙ্গে তাল রেখে রাখাল আড্ডি রোডও ঢের বদলে গেছে। এখানে বহুকাল কাটিয়ে না গেলে হিরণ্ময় চিনতেই পারতেন না। বেশির ভাগ পুরনো বাড়িঘরের চিহ্নমাত্র নেই। কুড়ি পঁচিশ ফিট চওড়া এই সরু রাস্তাতেও মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিংয়ের ছড়াছড়ি। দূর থেকে গলির চেহারা দেখে হিরণ্ময়ের মনে হয়েছে ব্রজরাখালবাবুর বাড়িটা খুঁজে বার করা সম্ভব হবে না যদি না সেটা আগের মতো থাকে।

তাঁদের নিজেদের যে বাড়িটা এখানে ছিল সেটাও কি তেমনই আছে? হঠাৎ সেই ছেড়ে-যাওয়া বাসস্থান সম্পর্কে এক ধরনের আবেগ অনুভব করতে থাকেন হিরণ্ময়।

রাখাল আড্ডি রোডে ঢুকে ক'পা এগিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন হিরণ্ময়। ডান পাশের তৃতীয় বাড়িটা একটা পাঁচতলা উঁচু ম্যানসন—নাম 'গৌরী কুঞ্জ'। পঁচিশ বছর আগে এখানে পুরনো শ্যাওলা-ধরা একতলা একটা বাড়ি যে ছিল, এখন আর তা বোঝার উপায় নেই। সেই বাড়িটাই ছিল হিরণ্ময়দের, অবশ্য সেটার কোনো নাম ছিল না। বাবা ওটা বিক্রি করে ওল্ড বালিগঞ্জ চলে যান। পূর্বপুরুষের বাড়ি বেচে চলে যাবার পেছনে ছিল বিজলী।

'গৌরী-কুঞ্জ'-র দিকে তাকিয়ে চিনচিনে ব্যথার মতো একটু কষ্ট অনুভব করতে থাকেন হিরণ্ময়। এখানে শুধু তাঁরই জন্ম হয় নি, তাঁকে নিয়ে তাঁদের বংশের পাঁচ পাঁচটা জেনারেশন কাটিয়ে গেছে।

কয়েক পলক বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে ফের হাঁটতে শুরু করেন হিরণ্ময়, যেন পূর্বজন্মের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছেন।

তাঁদের বাড়ির পর ছিল রক্ষিতদের ইটের দেওয়াল আর টিনের চালের বাড়ি, তারপর হারাধন সান্যালের ছোট্ট সেকেলে দোতলা। সান্যালদের পর কুণ্ডুদের, মিত্তিরদের আর পাল-চৌধুরীদের বাড়ি। সবগুলোই অনেক কালের পুরনো। সেকালের একটা বাড়িও আর নেই। সেগুলোর জায়গায় চারতলা-পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস উঠেছে।

এভাবে পনের ষোলটা বাড়ি পেছনে ফেলে কেষ্ট সাহাদের টিনের চালের দোতলা বাড়ির সামনে এসে পড়েন হিরণ্ময়। কী আশ্চর্য, এটা পঁচিশ বছর আগের মতোই রয়েছে। এমন কি তার পরের আট দশটা বাড়িরও কোনোরকম পরিবর্তন হয় নি। অর্থাৎ এগুলোর মালিকেরা জমি জায়গা ঘরদোর বিক্রি করে অন্য কোথাও চলে যায় নি।

হঠাৎ একটা কথা ভেবে খুব অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন হিরণ্ময়। রাখাল আড্ডি রোডের সে আমলের বাসিন্দারা সবাই তাঁকে চেনে।

তাদের কেউ তাঁকে দেখে ফেললে বিজলীর ব্যাপারে কিছু হয়তো জিজ্ঞেস করবে না কিন্তু তাদের চোখেমুখে এমন অশ্লীল কৌতূহল ফুটে উঠবে যে তিনি একেবারে কুঁকড়ে যাবেন। বিজলী নানা দিক থেকেই তাঁর ক্ষতি করে দিয়ে গেছে। পরক্ষণে অবশ্য হিরণ্ময়ের মনে হয়, পঁচিশ বছরে তাঁর চেহারা অনেক পালটে গেছে। চুল উঠে উঠে মাথার সামনের দিকটা এখন একেবারে ফাঁকা। তা ছাড়া বেশ মোটাও হয়ে গেছেন। চিবুকের তলায় ভারী থাক পড়েছে। যে ছিপছিপে, পাতলা গড়নের, মাথায় কুচকুচে কালো চুলভর্তি, তরুণ হিরণ্ময়কে পঁচিশ ছিরিশ বছর আগে এখানে সারাক্ষণ দেখা যেত, তাঁকে এখন ফস করে চিনে ফেলা মুশকিল। তা ছাড়া পুরনো দিনের লোকজনেরা অনেকে নিশ্চয়ই বেঁচে নেই. আবার অনেকে এ পাড়া ছেড়ে হয়তো চলেও গেছে। কাজেই এদিক থেকে মানসিক চাপ বেশ কিছুটা কমে যায় হিরণ্ময়ের।

রক্ষিতদের বাড়ির পর বেশ কয়েকটা বাড়ি চিনতে অসুবিধা হল না। সেগুলোর কাঠামো আগের মতোই আছে। অর্থাৎ কিনা প্রোমোটাররা হাজার লোভ দেখিয়ে এই সব বাড়ির মালিককে টলাতে পারে নি।

এই বাড়িগুলোর সামনের রোয়াকে বা জানালায় যাদের দেখা যাচ্ছে তাদের কাউকে হিরণ্ময় চিনতে পারলেন না। তারাও তাঁকে লক্ষ্য করল না, কেউ কেউ উদাসীন ভঙ্গিতে দু-একবার তাকাল শুধু। পঁচিশ বছরে নতুন দুটো জেনারেসন এসে গেছে। যাদের ছোট দেখেছিলেন তারা এখন যুবক, অনেকে আবার প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে গেছে। না পরিচয় দিলে তাদের চেনা অসম্ভব। আর তিনি রাখাল আড্ডি রোড ছেড়ে যাবার পর যারা জন্মেছে তাদের চেনার প্রশ্নই ওঠে না।

সব মিলিয়ে পর পর পনের কুড়িটা বাড়ি পুরনো চেহারা অটুট রাখতে পেরেছে। তারপর ফের লাইন দিয়ে হাই-রাইজ।

হিরণ্ময়ের মনে আছে, রাখাল আড্ডি রোড চলতে চলতে আধখানা সার্কেলের আকারে যেখানে ঘুরে পুরনো আলিপুরের দিকে গেছে ঠিক সেই বাঁকটা থেকে আট দশটা বাড়ির পর ব্রজরাখালের বাড়ি। কিন্তু সেখানে গিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে গেল

হিরণ্ময়ের। রাস্তার মুখের দিকে নতুন বাড়িগুলো চারতলা পাঁচতলার বেশি নয় কিন্তু এখানে সবই ছ'তলা, সাততলা। বাড়িগুলো আকাশকে প্রায় আড়াল করে রেখেছে।

ব্রজরাখালের টিনের চালের বাড়ির ঠিকানা ছিল তেইশের বারো বাই ডি। একে তাকে জিজ্ঞেস করে করে হিরণ্ময় নম্বরটা বার করে যখন সামনে এসে দাঁড়ালেন, পুরনো সেই বাড়িটার এক টুকরো টিনও কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সেখানে একটা সাততলা আপার্টমেন্ট হাউস দাঁড়িয়ে আছে।

ঝকঝকে উর্দিপরা দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করতে সে জানায়, ব্রজরাখাল চক্রবর্তী নামে কেউ এখানে থাকে না। তবে একটা খবর তার কাছে পাওয়া গেল, এ বাড়ির প্রোমোটার সুখময় গোস্বামী টপ ফ্লোরের গোটাটা নিয়ে থাকেন। গোস্বামী সাহেব হয়তো ব্রজরাখালের হদিস দিতে পারেন।

লিফটে করে সিক্সথ ফ্লোরে এসে কলিং বেল বাজাতেই চাকর এসে দরজা খুলে হিরণ্ময়ের কাছে তাঁর আসার উদ্দেশ্য জানতে চায়।

হিরণ্ময় বলেন, 'আমি গোস্বামী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

তাঁকে চমৎকার সাজানো ড্রইংরুমে বসিয়ে চাকর চলে যায়। পাঁচ মিনিটের ভেতর খুব স্মার্ট চেহারার মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢোকেন। পরনে ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবি। ইনিই যে সুখময় গোস্বামী তা বোঝা গেল।

লোকটি বেশ ভদ্র। হাতজোড় করে বলেন, 'নমস্কার—'

প্রতি-নমস্কার করে হিরণ্ময় শুধু নিজের নামটাই জানান, অন্য পরিচয় দেন না। বলেন, 'আপনার কাছে একটু সাহায্যের জন্যে এসেছি।'

সুখময় বেশ একটু অবাক হয়েই বলেন, 'কী ধরনের সাহায্য ?'

'আপনাদের দারোয়ানের কাছে শুনলাম, আপনি এ বাড়ির প্রোমোটার।'

'হ্যাঁ।'

'পঁচিশ বছর আগে ব্রজরাখাল চক্রবর্তী নামে এক ভদ্রলোক

এখানে থাকতেন। মানে ঠিক এই জায়গায় একটা টিনের বাড়ি ছিল। ব্রজরাখাল ছিলেন তার মালিক। আমি তাঁর সম্বন্ধে জানতে চাই। তিনি বেঁচে আছেন কিনা, থাকলে কোথায় আছেন —এই সব আর কি।'

হিরণ্ময়ের চেহারার মধ্যে এমন কিছু আছে যা দেখলে সম্ভ্রম হয়। সুখময় বলেন, 'ব্রজরাখালবাবু আপনার কেউ হন?'

হিরণ্ময় অস্বস্তি বোধ করেন। বলেন, 'তা একরকম বলতে পারেন।'

'কিছু মনে করবেন না, আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা আছে, তবে এত বছর বাদে তাঁর খোঁজ করছেন—'বলতে বলতে থেমে যান সুখময়।

হিরণ্ময় বলেন, 'আমরা কলকাতায় থাকতাম না। সবে পাঁচদিন হলো এসেছি।'

একটু চুপ করে থেকে কিছু ভাবেন সুখময়। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, 'সরি, আপনাকে বোধহয় সাহায্য করতে পারব না।'

হিরণ্ময় ভেতরে ভেতরে হতাশ হয়ে পড়েন। সকালবেলা এত ছোটাছুটি একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেল!

এরপর আর বসে থাকা যায় না। হিরণ্ময় যখন ভাবছেন উঠে পড়বেন, হঠাৎ সুখময়ের কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় একটু ব্যস্তভাবে তিনি আবার বলেন, 'আপনাকে শুধু এই ইনফরমেশনটুকু দিতে পারি ব্রজরাখালবাবুর কাছ থেকে টিনের বাড়িসুদ্ধ এই জায়গাটা আমি কিনেছিলাম। ভাল দামও দিয়েছি।'

আগ্রহশূন্যের মতো হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেন, 'কতদিন আগে কিনেছিলেন?'

'বছর পনের-ষোল তো হবেই।'

'তার মানে তখনও তিনি বেঁচে ছিলেন।'

'তা না হলে আর তাঁর কাছ থেকে কিনলাম কী করে?' বলে একটু হাসলেন সুখময়।

একটু চিন্তা করে হিরণ্ময় বলেন, 'বাড়ি বিক্রির সময় ব্রজ-রাখালবাবু কি একাই এখানে ছিলেন, না ওঁর কাছে আর কেউ

থাকত?' নাম না করেও কৌশলে বিজলীর কথা জানতে চাইলেন তিনি।

কিছুক্ষণ আধবোজা চোখে স্মৃতির ভেতর হাতড়াতে থাকেন সুখময়। তারপর মাথাটা ডাইনে এবং বাঁয়ে বার কয়েক নেড়ে বলেন, 'না, না। উনি একাই থাকতেন। যদ্দুর মনে পড়ছে আর কাউকে দেখিনি।

'আপনি সিওর?'

'হানড্রেড পারসেন্ট। আমার মেমোরিটা খুব খারাপ না স্যার। বাড়ি কেনার আগে মিনিমাম পঁচিশ বার ও'র কাছে এসেছি। আর কেউ থাকলে চোখে কি পড়ত না? আরে—আরে মনে পড়েছে, ব্রজরাখালবাবুকে নিজের হাতে রান্না করেও তো খেতে দেখেছি।'

'আচ্ছা সুখময়বাবু—'

'বলুন—'

'আপনি কি জানেন, বাড়ি বেচার পর উনি কোথায় চলে গিয়েছিলেন?'

এবার আর এক মুহূর্ত'ও চিন্তা করতে হল না সুখময়'ক। বললেন, 'জানি। কালিঘাটে ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটে ও'র এক দূর সম্পর্কের শালার কাছে।'

হিরণ্ময় মনে করতে পারলেন না, ব্রজরাখালের এরকম কোনো শালা আছে কিনা। জিজ্ঞেস করেন, 'ভদ্রলোকের নামটা জানেন?'

'নিশ্চয়ই জানি—জগন্নাথ চাটুজ্জ্যে। লোকটা জমি-বাড়ি বেচা-কেনার দালালি করে। সে-ই ব্রজরাখালবাবুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ করে দিয়েছিল। এখানে এগার কাঠা জমি আছে। তার ওপর আগে যে টিনের স্ট্রাকচার ছিল তা তো আপনি জানেনই। জমি আর টিনের চালার টোটাল দামের ওপর টু পারসেন্ট ব্রোকারেজ খেয়েছে জগন্নাথ।'

জগন্নাথ কতটা কী দালালি আদায় করেছে তা নিয়ে বিন্দু-মাত্র দুশ্চিন্তা নেই হিরণ্ময়ের। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটে গেলে ব্রজরাখালবাবুর সঙ্গে দেখা হতে পারে, আপনি কী বলেন?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন সুখময়, 'ঠিক বলতে পারছি না। জগন্নাথের সঙ্গে অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তবে—'

'কী ?'

'জায়গাটা তো কাছেই। একবার চান্স নিয়ে দেখুন না। ব্রজরাখালবাবু যদি এর মধ্যে মারা না যান কি আর কোথাও না গিয়ে থাকেন, দেখা হবার পসিবিলিটি আছে।'

'জগন্নাথ চাটুজ্জ্যের বাড়ির নম্বরটা জানা আছে ?'

'আছে। থার্টি সেভেন বাই এইট্টি বাই এম।'

'অনেক ধন্যবাদ।' সোফা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হিরণ্ময় বলেন, 'নমস্কার।'

তিন

এখন সবে আটটা বেজে দশ। কলকাতা শহরের ব্যস্ততা সেভাবে শুরু হয়নি। শরৎকালের এই সকালে তার গায়ে ঢিলেঢালা একটা আলস্যের ভাব জড়িয়ে রয়েছে।

রাখাল আড্ডি রোড ধরে আবার সেন্ট্রাল রোডে চলে আসেন হিরণ্ময়। রাস্তাটার মুখেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। একটা ট্যাক্সি ধরে ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটে, জগন্নাথ চাটুজ্জ্যের সেকেলে দোতলা বাড়িটা খুঁজে বার করতে মিনিট কুড়ির বেশি লাগল না।

কলিং বেল নেই। কড়া নাড়তে একটা পাকানো চেহারার ময়লা লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা আধবয়সী লোক দরজা খুলে মুখোমুখি দাঁড়াল। তার মাথার মাঝ বরাবর চকচকে মসৃণ টাক, দু'ধারে কাঁচাপাকা কোঁকড়া চুলের ঘের। ভুরুর চুলও কোঁকড়ানো। ভাঙা গাল, খাড়া চোয়াল, থ্যাবড়া থুতনি, শিরা বার করা হাত। মুখে দু-তিনদিনের জমা দাড়ি।

লোকটার বাদামী চোখে অত্যন্ত তীক্ষ্ন দৃষ্টি। সে যে খুবই

ধুরন্ধর, এক নজরেই টের পাওয়া যায়। সে কিছু বলার আগেই হিরণ্ময় নিজের নাম জানিয়ে বলেন, 'জগন্নাথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

লোকটা বলে, 'আমিই জগন্নাথ। ভেতরে আসুন।'

জগন্নাথ হিরণ্ময়কে একতলার একটা ঘরে নিয়ে এসে বলে, 'বসুন।'

ঘরটা লম্বাটে এবং চাপা। আলোটালো এখানে খুব বেশি ঢোকে না। সুইচ টিপে টিমটিমে একটা বাল্ব জেবলে দিল জগন্নাথ। সেই আলোতে দেখা যায় গোটাকয়েক হাতলভাঙা চেয়ার আর খেলো কাঠের সেণ্টার টেবল ছত্রখান হয়ে আছে। এক কোণে সরু তক্তাপোশে ছেঁড়া জাজিমের ওপর ময়লা চাদর পাতা। চাদরটা খাটো, তাই জাজিমটা পুরো ঢাকা পড়েনি। ফাটা কয়েকটা জায়গায় নারকেল ছোবড়া দেখা যাচ্ছে। এটা যে এ বাড়ির ড্রইংরুম বুঝতে অসুবিধা হয় না।

সমস্ত বাড়িটা যেন আস্ত রণাঙ্গন। বসার ঘর থেকে দেখা যাচ্ছে, নানা আকারের অনেকগুলো ছেলেমেয়ে তুমুল হইচই করতে করতে মারপিট বাধিয়ে দিয়েছে। একবার তারা দুড় দুড় করে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যাচ্ছে, পরক্ষণে আবার নেমে আসছে। সবার গলা ছাপিয়ে ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকে কোনো মহিলার চিৎকার ভেসে আসছে, 'ওরে জানোয়ারের গুষ্টি, তোদের যমে ভুলে গেছে। আমার হাড়-মাংস একেবারে ভাজা ভাজা করে দিলে। মর মর, ওলাওঠা হোক তোদের! নির্বংশ হয়ে যা।'

হারমোনিয়ামের সবগুলো রিড একসঙ্গে চেপে ধরে বেলো করলে যেমন শব্দ বেরোয় মেয়েমানুষটির কণ্ঠস্বর অবিকল সেই রকম। কানের পর্দা ফাটানো, জবরদস্ত আওয়াজ। তার ওপর গালাগালের ভাষাটি চমকে দেবার মতো। যেমন তার বাঁধুনি তেমনি বলার স্টাইল।

এমন পরিস্থিতিতে আগে কখনও পড়েন নি হিরণ্ময়। একেবারে হকচকিয়ে যান তিনি।

জগন্নাথ দার্শনিকের মতো উদাসীন ভঙ্গিতে বলে, 'ও কিছু না, আমার ছেলেমেয়েগুলো একটু ত্যাঁদোড় কিনা, তাই ওদের মা

শাসন করছে। ওদিকে কান দেবেন না। ও কী, দাঁড়িয়ে কেন? বসুন--'

বিমূঢ়ের মতো একটা চেয়ারে বসে পড়েন হিরণ্ময়।

জগন্নাথ বলে, 'আগে দরজাটা বন্ধ করে আসি, তা হলে আওয়াজটা কম হবে।' দরজা ভেজিয়ে ফিরে এসে হিরণ্ময়ের মুখোমুখি বসতে বসতে বলে, 'আপনাকে আমি চিনি।'

হিরণ্ময় চমকে ওঠেন, 'আমাকে চেনেন!'

'চিনব না? আপনি ফেমাস ম্যান, খবরের কাগজে আপনার ছবি দেখেছি। তা ছাড়া—' বিগলিত ভঙ্গিতে বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে যায় জগন্নাথ।

হিরণ্ময় ভেতরে ভেতরে একটু চাপা উদ্বেগ বোধ করেন। বলেন, 'তা ছাড়া কী?'

'আমাদের সঙ্গে আপনার একটা সম্পর্কও তো হয়েছিল। নেহাত বিজলীটা—'

জগন্নাথকে থামিয়ে দিয়ে হিরণ্ময় শশব্যস্তে বলে ওঠেন, 'ও সব কথা থাক। একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি।'

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় কোমরে একটা ঝাঁকি মেরে উঠে দাঁড়ায় জগন্নাথ, 'কাজের কথা নিশ্চয়ই হবে। প্রথম দিন আমাদের বাড়ি এলেন। একটু চায়ের—'

বোঝা যায়, আপ্যায়নের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে জগন্নাথ। তাকে থামিয়ে দিয়ে হিরণ্ময় বলেন, 'চায়ের দরকার নেই। কিছুক্ষণ আগেই খেয়েছি। আপনাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করেই চলে যাব।'

অগত্যা জগন্নাথ ফের বসে পড়ে। গোড়া থেকেই তার চোখে-মুখে এক ধরনের সতর্কতা ছিল। সে চুপচাপ হিরণ্ময়কে লক্ষ্য করতে থাকে।

নিজের বক্তব্যটা মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে হিরণ্ময় সোজাসুজি জগন্নাথের চোখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলেন, 'শুনেছি ব্রজরাখালবাবু জীবনের শেষ ক'টা বছর আপনার কাছেই ছিলেন।' ব্রজরাখাল চেতলা থেকে এখানে চলে এসেছিলেন, এটুকুই জানা

গেছে। কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত এ বাড়িতে কাটিয়েছেন কিনা সুখময় বলতে পারেন নি। আন্দাজেই কথাটা বললেন হিরণ্ময়।

আরো সতর্ক হয়ে যায় জগন্নাথ। বলে, 'আপনি কার কাছে এ খবর পেলেন?'

'আপনার কাছে আসার আগে আমি চেতলায় গিয়েছিলাম।'

'বুঝেছি। প্রোমোটর সুখময় গোস্বামী খবরটা দিয়েছে। আমার ঠিকানাও নিশ্চয়ই ওখানে পেয়েছেন।'

'হ্যাঁ।'

একটু চুপ।

বলবে কি বলবে না, এটা ঠিক করতে খানিকটা সময় নেয় জগন্নাথ। তারপর বলেই ফেলে, 'আপনি ঠিকই শুনেছেন। শেষ দিকটায় ব্রজরাখালদা আমার কাছেই ছিলেন। বছর দুই আগে এ বাড়িতেই মারা গেছেন। তবে—'

হিরণ্ময় বলেন, 'তবে কী?'

'চেতলার জমি আর বাড়ি বিক্রির টাকাটা ব্রজরাখালদা কী করেছেন, আমি বলতে পারব না।' বলে চোখের কোণ দিয়ে হিরণ্ময়ের প্রতিক্রিয়া দেখতে থাকে জগন্নাথ।

এ সব টাকাপয়সার কথা ভাবেনই নি হিরণ্ময়। আচমকা জগন্নাথ প্রসঙ্গটা তোলায় বেশ অবাকই হয়ে যান। লোকটার মনে পাপ আছে। হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ব্রজরাখালের মৃত্যুর পর তাঁর যা কিছু ছিল সব বেমালুম আত্মসাৎ করেছে জগন্নাথ। যদিও আইনত হিরণ্ময় মৃত ব্রজরাখালের পার্থিব সম্পত্তির একটি কানাকড়িও দাবি করতে পারেন না তবু এ ব্যাপারে যদি প্রশ্ন তোলেন তাই আগে ভাগেই সাফাই গেয়ে রাখল জগন্নাথ।

ব্রজরাখালের টাকাকড়ির সদ্গতিটা কিভাবে হয়েছে তা নিয়ে আদৌ মাথাব্যথা নেই হিরণ্ময়ের। তিনি যেন কথাটা শুনতেই পান নি, এমনভাবে বলেন, 'যে কথাটা জানতে এসেছি এবার সেটা বলি।'

টাকার ব্যাপারে হিরণ্ময়ের আগ্রহ নেই জানার সঙ্গে সঙ্গে বেশ আরাম বোধ করে জগন্নাথ। উৎসুক সুরে সে বলে, 'আপনি বোধ হয় বিজলী আর তার মেয়ের সম্বন্ধে জানতে চাইছেন—'

লোকটা যে অতীব তুখোড়, কেউ হাঁ করলে তার পেটের ভেতর পর্যন্ত দেখতে পায় সেটা টের পাওয়া গেল। একটু ইতস্তত করে গলা খাকরে হিরণ্ময় বলেন, 'হ্যাঁ, মানে—'

জগন্নাথ বলে, 'আপনাদেব সবার মাথায় নর্দমার পাঁক ঢেলে দিয়ে বিজলী সেই হারামজাদা কনট্রাক্টরটার সঙ্গে মেয়ে নিয়ে তো পালাল। এদিকে তার জন্যে আমরা আত্মীয়স্বজনরা পর্যন্ত বহু-দিন লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি নি। ছ্যা—ছ্যা—'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন হিরণ্ময়। যদিও বিজলীর সঙ্গে তাঁর আর কোনোরকম সম্পর্কই নেই, তবু জগন্নাথের ঘৃণা এবং ধিক্কারের খানিকটা ঝাঁঝ যেন তাঁর গায়ে এসেও লাগে। লোকটা কী ভাবছে কে জানে। সে কি মনে করেছে, বিজলী সম্পর্কে তাঁর মন হঠাৎ দুর্বল হয়ে পড়ায় তার খোঁজখবর নিতে এসেছেন? বিজলীর ব্যাপারে তাঁর যে বিন্দুমাত্র মোহ নেই, তিনি তাঁর খোঁজ করছেন সম্পূর্ণ অন্য এক কারণে, এ নিয়ে এই লোকটার সঙ্গে আলোচনা করার ইচ্ছাই নেই তাঁর। মুখ নিচু করে হিরণ্ময় শুধু জিজ্ঞেস করেন, 'বিজলী এখন কোথায় আছে জানেন?'

জগন্নাথের চোখেমুখে অশ্লীল কৌতূহলের একটু ঝিলিক দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। সে হয়তো একটা কেচ্ছার গন্ধ পেয়েছে। সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, 'কেন, কিছু দরকার আছে?'

গম্ভীর মুখে হিরণ্ময় উত্তর দেন, 'আছে।'

এতদিন বাদে হঠাৎ হিরণ্ময় কেন বিজলীর খোঁজ করছেন তা জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে জগন্নাথ। কিন্তু হিরণ্ময়ের মধ্যে এমন এক প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব রয়েছে যে এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করতে খুব সম্ভব সাহস হয় না তার। হঠাৎ উঠে অতৃপ্ত প্রেতাত্মার মতো ঘরময় খানিক পায়চারি করে সে। তারপর ফের চেয়ারে বসে বলে, 'ছ মাস আগে তার খবর পেয়েছিলাম। নর্থ বেঙ্গলে, বর্ডারের কাছে একটা টাউনে তখন থাকত। খুব সম্ভব এখনও আছে।'

'কী নাম টাউনটার?'

'আনন্দপুর।'

'যে কনট্রাক্টরের সঙ্গে চলে গিয়েছিল তার সঙ্গেই কি এখনও রয়েছে ?'

'তাই শুনেছি।'

'আরেকটা কথা—'

'বলুন।'

'যে বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে বিজলী পালিয়েছিল সে-ও কি ওর কাছে আছে ?'

একটু চিন্তা করে জগন্নাথ বলে, 'যদি তার বিয়ে টিয়ে না হয়ে থাকে হয়তো আছে। আমি ঠিক জানি না।' একটু থেমে ফের শুরু করে, 'ওদের কথা জানতে চাইছেন কেন ? দেখা করবেন ?'

জগন্নাথের প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেন, 'ছ'মাস আগে কার কাছে ওদের খবর পেয়েছিলেন ?'

'আমার জানাশোনা একটা লোকের কাছে। সে বিজলীদের চেনে। কী একটা দরকারে আনন্দপুর গিয়েছিল। ফিরে এসে বললে—'

জগন্নাথকে থামিয়ে দিয়ে হিরণ্ময় বলেন, 'খবরটা পেয়ে খুব উপকার হল। আচ্ছা এখন চলি—' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান।

জগন্নাথ ঘরের দরজা খুলে দিয়ে হিরণ্ময়ের সঙ্গে সদর দরজা পর্যন্ত আসে। গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি আনন্দপুর যাবেন ?'

চোখমুখ দেখেই টের পাওয়া গিয়েছিল জগন্নাথ লোকটা খুবই চতুর। কেন হিরণ্ময় বিজলী এবং তার মেয়ের সম্বন্ধে এত খোঁজ-খবর নিচ্ছেন জানার জন্য সে উদ্‌গ্রীব। হিরণ্ময় তার প্রশ্নের জবাব দেন না।

ব্রজরাখালের টাকা পয়সা নিয়ে যিনি নিজের থেকে কোনোরকম কৌতূহল দেখান নি তাঁর সঙ্গে বোধহয় শুভাকাঙ্ক্ষীর মতো ব্যবহার করা যায়। জগন্নাথ এবার অন্তরঙ্গ গলায় বলেন, 'একটা কথা বলব ?'

হিরণ্ময় নিরুৎসুক সুরে বলেন, 'বলতে পারেন—'

'কনট্রাক্টর লোকটা খুব নোংরা, জঘন্য টাইপের। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ না করাই ভাল।'

'আপনার কথা আমার মনে থাকবে।' বলে আর দাঁড়ান না, অন্যমনস্কর মতো লম্বা লম্বা পায়ে সদানন্দ রোডের দিকে চলে যান।

চার

ওল্ড বালিগঞ্জে হিরণ্ময় যখন ফিরলেন, দশটা বেজে গেছে। গেট পেরিয়ে ভেতরে পা দিয়েই টের পাওয়া গেল, সারা বাড়ি তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। হইচই, চেঁচামেচি, একতলায় দোতলায় বাড়ির লোকজনের ছোটাছুটি ইত্যাদি ছাপিয়ে রমলার উত্তেজিত চিৎকার ভেসে আসছে, 'মানুষটা সকালবেলা উঠে কোথায় চলে গেল, কারুর চোখে পড়ল না! তোমরা কি অন্ধ? যত অকর্মার ধাড়ি! আটটা পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমোবে! কী হবে তোমাদের রেখে? সব্বাইকে দূর করে দেবো।'

রমলার ধাতটা কড়া ধরনের। স্নায়ুপ্রধান বলতে যা বোঝা যায় তিনি তা-ই। সামান্য কারণে তাঁর মেজাজ বিগড়ে যায়। তখন সামনে যাকে পান তাকেই বকাঝকা করতে থাকেন। কাজের লোকেদের ওপর এই যে তর্জন গর্জন করছেন কিন্তু তাঁর খেয়াল নেই এ বাড়িতে সব চাইতে দেরিতে ঘুম ভাঙে তাঁর নিজের এবং তাঁর দু'টি ছেলেমেয়ের। হঠাৎ হঠাৎ রেগে যাওয়া ছাড়া মানুষটা এমনিতে ভাল—সহৃদয়, সহানুভূতিশীল, স্নেহপ্রবণ।

হিরণ্ময়কে প্রথম দেখতে পায় ড্রাইভার জগমোহন। সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'বড়ে সাব লৌটকে আয়া, লৌটকে আয়া—'

সঙ্গে সঙ্গে হুলস্থুলটা তিন গুণ বেড়ে যায়।

দুড়দাড় করতে করতে ওপর থেকে পলা আর টিপু নিচে চলে আসে। রমলা ভারী মানুষ, রেলিং ধরে ধরে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে তিনিও নেমে আসেন।

এদিকে কাজের লোকেরা দৌড়ে এসে হিরণ্ময়কে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সকলের চোখেমুখে উৎকণ্ঠা এবং বিস্ময়। তার কারণও আছে। হিরণ্ময়ের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নিয়ম আর

শৃঙ্খলায় বাঁধা। সকাল থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত তাঁর রুটিন এ-বাড়ির সবার মুখস্থ। কখনও, কোনো কারণেই এই কর্মসূচিতে হেরফের হবার উপায় নেই। সেই মানুষটা যে কাউকে না জানিয়ে এমন হুট করে বেরিয়ে পড়বেন এবং সারা জীবনের অভ্যস্ত নিয়ম আর ডিসিপ্লিনকে নিজের হাতে ভেঙে ফেলবেন, তা যেন ভাবা যায় না।

এত খ্যাতি এত প্রতিষ্ঠা হিরণ্ময়ের, কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি খুবই সাদাসিধে, কাজের লোকেদের প্রতি তাঁর ব্যবহার চমৎকার। নিজের অজস্র কাজ আর লেখাপড়ার মধ্যেও সময় করে তিনি তাদের খোঁজখবর নেন। দু'মিনিট দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে একটু গল্প করেন, সেই সঙ্গে মাঝেসাঝে সামান্য রসিকতাও। কাজের লোকেদের তিনি ফ্যামিলি মেম্বার ভাবেন, নিজেকে তাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন না।

কাজের লোকেদেরও তাই কোনোরকম আড়ষ্টতা বা ভয়টয় নেই। তারা হিরণ্ময়কে যতটা ভক্তি শ্রদ্ধা করে, ঠিক ততটাই ভালবাসে।

কেউ কিছু বলার আগে পলা আর টিপু কাছে ছুটে আসে। পরক্ষণে ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে পড়েন রমলা। হাঁপাতে হাঁপাতে উদ্বিগ্ন মুখে বলেন, 'কী ব্যাপার, ভোরবেলা কোথায় গিয়েছিলে?'

হাতের ইশারায় কাজের লোকেদের চলে যেতে বলে স্ত্রীর দিকে ফেরেন হিরণ্ময়, 'ওপরে চল, বলছি।'

দোতলায় উঠতে উঠতে রমলা গজগজ করতে থাকেন, 'এর কোনো মানে হয়? সকাল থেকে দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে আছি, সবাইকে বকাঝকা করছি। ভাবছিলাম থানায় ফোন করব।'

রমলার দুর্ভাবনার যথেষ্ট কারণ আছে। হিরণ্ময় বলেন, 'থানায় খবর দেবার কথা ভাবলে কী করে? আমি কি ছেলেমানুষ যে হারিয়ে যাব?'

'সারা জীবন যে কখনও অনিয়ম করেনি, এরকম একটা কাণ্ড করলে মানুষ নার্ভাস হয়ে পড়ে না?'

দোতলায় নিজেদের বেডরুমে স্বামীকে নিয়ে আসেন রমলা। টিপু আর পলাও তাঁদের সঙ্গে আসে।

রমলা বলেন, 'এবার বল, ভোরবেলা কোথায় বেরিয়েছিলে ?'

বিজলী বা মল্লির নাম রমলাদের সামনে মুখে আনা চলবে না। অনেক বছর আগে যে দু'টি মানুষ তাঁর জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল তাদের খোঁজে চেতলা আর কালীঘাটে অতি মূল্যবান চারটি ঘণ্টা যে কাটিয়ে এলেন তা জানাজানি হলে প্রতিক্রিয়া কী হবে সেটা হিরণ্ময়ের অজানা নয়।

স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েকে এতটা সময় বাইরে কাটিয়ে আসার কৈফিয়ৎ কিভাবে দেবেন তার একটা খসড়া মনে মনে ঠিকই করে এসেছেন। তাঁর মুখচোখ দেখে বা কথা শুনে ঘুণাক্ষরেও যাতে রমলারা কিছু ধরতে না পারেন সেজন্য তাঁর স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে আছে।

হিরণ্ময় বলেন, 'ভোর বেলা উঠে হঠাৎ মনে হল, অনেকদিন তো কলকাতায় ছিলাম না, যাই খানিকটা হেঁটে আসি। তোমরা ঘুমুচ্ছিলে, তাই আর ডাকিনি।'

'আমরা না হয় ঘুমিয়ে ছিলাম। সীতাকে বলে যেতে পারতে। সে তো তোমাকে মর্নিং টী দিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, ওটা ভুল হয়ে গেছে।'

রমলা বলেন, 'তোমার তো কোনো কালে মর্নিং ওয়াকের বাতিক ছিল না। সে যাক, চার ঘণ্টা ধরে হাঁটলে ?'

হিরণ্ময় বলেন, 'হ্যাঁ। সোজা লেকে চলে গিয়েছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে একেবারে টালিগঞ্জ রেল ব্রিজের কাছে। ভীষণ ভাল লাগছিল। তবে একসঙ্গে এতটা হাঁটার অভ্যাস তো নেই, টায়ার্ড হয়ে পড়েছিলাম। ফেরার পথে লেকের ধারে গাছতলায় বসে অনেকক্ষণ রেস্ট নিলাম, তাই লেট হয়ে গেল।' একটু থেমে আবার শুরু করেন, 'জানো রমলা, অল্প বয়সে লেকে খুব ঘুরতাম। কত রকমের রেয়ার গাছ ছিল এখানে, কত রকমের পাখি আসত ! কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল চারপাশ। কিন্তু সে লেক আর নেই, কলকাতার আর সব কিছুর মতোই এর বিউটি অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। তবু যা আছে—'

লেক সম্পর্কে হিরণ্ময়ের আক্ষেপ রমলাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'ফিরে এলে কি হেঁটেই ?'

হিরণ্ময় কিঞ্চিৎ থতিয়ে যান। লেকের কথা সাতকাহন করে বলেও রমলাকে আসল জায়গা থেকে নড়ানো যায় নি। চার ঘণ্টা সময় কিভাবে তিনি ব্যয় করেছেন তার চুলচেরা হিসেব নিয়ে তবে ছাড়বেন। হিরণ্ময় চোখকান বুজে বলেন, 'হ্যাঁ। সেই জন্যেই তো দেরি হল।'

'ডাক্তাররা তোমাকে কী অ্যাডভাইস করেছে?'

রমলার প্রশ্নের মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল। ক'বছর আগে হিরণ্ময়ের যে হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল তারপর থেকে ডাক্তাররা তাঁকে যতটা সম্ভব সতর্ক থাকতে বলেছেন। বেশি মানসিক বা শারীরিক পরিশ্রম করা চলবে না। এমন কিছুর মধ্যে জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না যাতে দুশ্চিন্তা বা টেনসান হয়।

হিরণ্ময় ব্যাপারটাকে হালকা করে দেবার জন্য বলেন, 'আমি কি আর রেসের ঘোড়ার মতো দৌড়ে এসেছি, আস্তে আস্তে হেঁটে এসেছি। আমার শরীরের অবস্থা আমি জানি না?'

কথায় কথায় ওঁরা দোতলায় হিরণ্ময়ের পড়ার ঘরে চলে এসেছিলেন। হিরণ্ময় ডিভানে বসে পড়েন। রমলা বসেন একটু দূরে একটা চেয়ারে। টিপু আর পলা বসে না, তারা দাঁড়িয়ে থাকে।

টিপু আর পলা প্রায় একসঙ্গেই বলে, 'তুমি এভাবে আর বেরিয়ো না বাবা।'

স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা যে তাঁকে যথেষ্ট ভালবাসে, হিরণ্ময় তা জানেন। স্ট্রোকটা হয়ে যাবার পর তাঁর স্বাস্থ্যের জন্য ওরা প্রায় সারাক্ষণই উৎকণ্ঠিত থাকে। যতটা সম্ভব তাঁকে চোখে চোখে রাখতে চেষ্টা করে। একটু হেসে হিরন্ময় বলেন, 'না রে, আর বেরুব না।'

রমলা জিজ্ঞেস করেন, 'আমাদের বাড়ি থেকে টালিগঞ্জের রেল ব্রিজ কতটা রাস্তা হবে?'

হিরণ্ময় মনে মনে হিসেব করে নিয়ে বলেন, 'সাড়ে তিন কি চার কিলোমিটার।'

'একবার ওখানে গেছ, তারপর ফিরে এসেছ। হঠাৎ আট কিলোমিটার হাঁটলে সুস্থ মানুষেরই শরীর খারাপ হয়ে যায়।

তোমার শরীর ভাল না, তার ওপর হাঁটার অভ্যেস নেই। আমি আজই ডাক্তার ডেকে তোমার ই সি জি করাব।'

'অকারণে বড় বেশি ভাবছ রমলা। আমি ঠিক আছি, ডাক্তার ডাকার দরকার নেই।'

'দরকার আছে কি নেই, সেটা আমি বুঝব।'

রমলা ভীষণ জেদী। একবার কিছু মাথায় চাপলে সেটি না করে ছাড়েন না। হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে হিরণ্ময় বলেন, 'যা ভাল বোঝো, কর।'

রমলা বলেন, 'তুমি এখন ভাল করে রেস্ট নাও। আমি চা আর ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসছি।' বলতে বলতে উঠে পড়েন।

অন্যদিন সীতাই সকালের খাবার টাবার নিয়ে আসে। আজ রমলা কেন সে দায়িত্ব নিতে চাইছেন, হিরণ্ময় তা বুঝতে পারেন। এমনিতে কোনোরকম অনিয়ম করেন না তিনি, তবু কখনও সামান্য এদিক ওদিক হয়ে গেলে যত্নের মাত্রাটা বেড়ে যায় রমলার।

দরজা পর্যন্ত গিয়ে কী ভেবে ঘুরে দাঁড়িয়ে রমলা জিজ্ঞেস করেন, 'আজ যথেষ্ট নিয়মভঙ্গ করেছ। বাইরে কিছু খেয়ে টেয়ে আসো নি তো?'

শশব্যস্তে হিরণ্ময় দু হাত নেড়ে বলে ওঠেন, 'আরে না না, আমি কি বাইরে কখনও খাই!'

'কী জানি, কলকাতায় এসে একদিনে আট কিলোমিটার হাঁটতে ভাল লাগল। রাস্তায় খাবারওলাদের কাছ থেকে কিনে খেতেও হয়তো ভাল লেগেছে।'

'বিশ্বাস কর, সত্যিই খাই নি।'

রমলা আর কিছু বলেন না।

হঠাৎ কী মনে পড়ে যাওয়ায় হিরণ্ময় সতর্কভাবে জিজ্ঞেস করেন, 'আচ্ছা, এর ভেতর আমার কি কোনো ফোন এসেছিল?' মল্লির চিন্তাটা ফের তাঁর মাথায় ফিরে এসেছে। সকালে ফোনে কথা বলতে বলতে লাইনটা কেটে গিয়েছিল। তারপর আবার মেয়েটা তাকে ফোন করেছিল কিনা তা জানা দরকার। পরক্ষণে হিরণ্ময়ের মনে হয় মল্লি ফোন করে থাকলে এবং তার পরিচয় রমলা জানতে পারলে এতক্ষণে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যেত। ফোনটা না আসায়

দ্ রকম প্রতিক্রিয়া হয় হিরণ্ময়ের। মল্লির সঠিক অবস্থাটা না জানায় উদ্বেগ এবং তার সঙ্গে রমলাদের কথা না হওয়ায় খানিকটা আরাম। ফোন এলে কথায় কথায় রমলারা হয়তো মল্লির পরিচয়টা জেনে যেতেন। তার পরিণাম কী হত, ভাবতেও সাহস হয় না।

রমলা বলেন, 'না, আসে নি।' বলে আর দাঁড়ান না, টিপ্ আর পলাকে নিয়ে চলে যান।

আরো আধ ঘণ্টা বাদে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে রমলা চলে গেছেন। এখন এ ঘরে হিরণ্ময় একেবারে একা।

ইণ্ডিয়ার নানা ইউনিভার্সিটি থেকে দ্'দিন আগে ক'টা চিঠি এসেছে। বিদেশ থেকেও তিন চারটে। দ্রদর্শনের সাক্ষাৎকারের জন্য একটা লিখিত অন্রোধও। সবগ্লিই যথেষ্ট জর্রি এবং খ্ব তাড়াতাড়িই উত্তর দেওয়া দরকার। এমনিতে হিরণ্ময় অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ, পরিশ্রমী। হাতের কাজ ফেলে রাখেন না। কিন্তু এই ম্হ্র্তে কোনো দিকেই লক্ষ্য নেই তাঁর। মল্লির চিন্তাটা সমস্ত দিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলতে শ্র্ করেছে।

কিভাবে মেয়েটার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়? জগন্নাথ জানিয়েছে, ওরা নর্থ বেঙ্গলে বর্ডারের কাছের শহর আনন্দপ্রে আছে। দার্জিলিঙে একবার যাওয়া ছাড়া উত্তরবঙ্গে আর কখনও যাননি হিরণ্ময়। তা-ও প্লেনে বাগডোগরায় পেণছে সেখান থেকে মোটরে গিয়েছিলেন। নর্থ বেঙ্গল সম্পর্কে তাঁর ধারণা ভাসা ভাসা, অস্পষ্ট। আনন্দপ্র শহরটার নাম তিনি আজই প্রথম শ্নেছেন। সেটা ঠিক কোথায় তা তাঁর জানা নেই।

হঠাৎ হিরণ্ময়ের মনে হয়, বিজলীপ্রভার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তো কবেই চুকে ব্কে গেছে। তা হলে মল্লির জন্য কেন এত ভাবছেন? কেন সারাটা সকাল চেতলা আর কালীঘাট করে বেড়ালেন? পর ম্হ্র্তেই তাঁর খেয়াল হয় মল্লি শ্ধ্ একটা নষ্ট দ্শ্চরিত্র মেয়েমান্ষের মেয়েই নয়, তাঁরও সন্তান। মল্লির জন্যই তো এতক্ষণ উদ্ভ্রান্তের মতো এখানে ওখানে ছ্টে বেড়িয়েছেন। কিন্তু কিছ্ করবেন যে, সেটা কিভাবে?

জগন্নাথের কথামতো ছ'মাস আগে বিজলীরা আনন্দপ্রে

ছিল। এখনও মল্লি তার মায়ের সঙ্গে সেখানেই আছে কিনা কে জানে। মল্লির কাছ থেকেও জানতে পারা যায়নি, সে কোত্থেকে ফোন করেছিল। সে যখন বলতে যাবে তখনই লাইনটা কেটে যায়।

ডিভানে আধশোয়ার মতো কাত হয়ে এইসব ভাবছিলেন হিরণ্ময়। হঠাৎ উঠে অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করতে থাকেন। আগে ভাল করে লক্ষ্য করেন নি, এখন মনে পড়ছে ভোরে মল্লি যখন ফোন করছিল, শেষ দিকটায় অস্পষ্টভাবে একটি পুরুষকণ্ঠের শাসানি ভেসে এসেছিল। তখনই সে লাইনটা কেটে দেয়। মল্লি যদি আর ফোন না করে কিংবা সেই লোকটা যদি ফোন করতে না দেয়? মেয়েটার সঙ্গে যোগাযোগের আর কোনো উপায়ই তো মাথায় আসছে না। তেইশ বছর পর চকিতে একবার নিজের অস্তিত্বের খবরটা জানিয়ে চিরকালের মতো মল্লি হারিয়ে যাবে?

ঝোঁকের বশে কিছুই করেন না হিরণ্ময়। তিনি ধীর, স্থির, বিচক্ষণ মানুষ। ভোরে মল্লির সঙ্গে কথা হয়েছে, এখন এগারটা বেজে বাইশ। ঘরময় এলোমেলো পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে ঠিক পাঁচ ঘণ্টা পর তিনি স্থির করে ফেলেন, আনন্দপুর যাবেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি আগে কখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেন নি। জীবনে এই প্রথম এত বড় একটা ব্যতিক্রম ঘটল।

আনন্দপুরে গেলেই যে মল্লির সঙ্গে দেখা হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবু হিরণ্ময়কে যেতেই হবে। সেখানে গিয়ে ব্যর্থ হলেও এটুকু সান্ত্বনা তাঁর থাকবে, নষ্ট মেয়েমানুষের সন্তান বলে মল্লিকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। পলা বা টিপু এমন অবস্থায় পড়লে যা করতেন তাই করবেন। হাজার হোক তিনি তো মল্লির জন্মদাতা।

আনন্দপুরে যাবার ব্যাপারটা কাউকে বলা যাবে না। বললে রমলারা তাঁকে আটকে তো দেবেনই, তা ছাড়া হাজার রকমের জবাবদিহিও করতে হবে। তবু শেষ পর্যন্ত যদি নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, রমলা তাঁকে একলা ছাড়বেন না, নিজেও সঙ্গে যেতে চাইবেন। হিরণ্ময়ের শরীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সর্বক্ষণ তাঁর সজাগ দৃষ্টি। আজ সকালে যেমন কাউকে না জানিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়েছিলেন ঠিক সেইভাবেই তাঁকে আনন্দপুর যেতে হবে।

অবশ্য আজই তিনি আনন্দপুর রওনা হচ্ছেন না, দুটো দিন অপেক্ষা করবেন। এর মধ্যে মল্লির ফোন এলে ভাল। তখন তার সম্বন্ধে সমস্ত কিছুই বিশদভাবে জানা যাবে। সম্ভব হলে কলকাতা থেকেই তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করবেন, নইলে না গিয়ে উপায় নেই। এই দু'দিন আনন্দপুর সম্বন্ধে যাবতীয় খবর তাঁকে জোগাড় করতে হবে এবং তা অত্যন্ত গোপনে।

মনে পড়ে গেল, দিল্লীতে যাবার আগে কলকাতার একটা বড় কলেজে বেশ কয়েক বছর পড়িয়েছিলেন। তাঁর একজন ছাত্র আই পি এস অফিসার, মাস চারেক আগেও লালবাজারে পোস্টেড ছিলেন। হাজার হাজার ছাত্রের মধ্যে বিশেষ একজনকে মনে করে রাখার কথা নয়। তবু অনুপমকে তিনি যে ভুলে যান নি তার কারণ তাঁর এই ছাত্রটি ছিলেন অসাধারণ ব্রাইট। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে অনুপম হোম ডিপার্টমেণ্টে চাকরি নিয়েছিলেন। তাতে হিরণ্ময়ের বেশ আক্ষেপ ছিল। মুখে না বললেও তিনি চেয়েছিলেন রিসার্চ টিসার্চ করে অমুপমের মতো ছাত্রেরা এডুকেসন ডিপার্টমেণ্টে আসুন, তাতে পরের জেনারেসনের ছাত্রছাত্রীদের উপকার হবে।

অনুপমকে মনে রাখার আরো একটা কারণ আছে। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই কলেজ বা ইউনিভার্সিটি থেকে বেরুবার পর সম্পর্ক রাখে না, বিশেষ করে যারা এডুকেসন ছাড়া অন্য সারভিস বা প্রোফেসনে চলে যায়। কিন্তু পুলিশে ঢুকলেও বরাবর অনুপম হিরণ্ময়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গেছেন। মাঝে মাঝে তাঁকে দিল্লীতে যেতে হত, তখন হিরণ্ময়ের সঙ্গে দেখা করতেন। অনুপম দিল্লী গেছেন অথচ তাঁর বাড়িতে লাঞ্চ বা ডিনার খেয়ে আসেন নি, এমন ঘটনা কখনও ঘটে নি। কলকাতা থেকেও এক-দু'মাস পর ফোন করে তাঁর খোঁজখবর নিতেন। অনুপমের শেষ ফোন পেয়েছিলেন মাস চারেক আগে।

লালবাজারের টেলিফোন নম্বরটা হিরণ্ময়ের মুখস্থ। সেখানে ফোন করে অনুপমের কাছ থেকে আনন্দপুর সম্পর্কে নিশ্চয়ই জানা যেতে পারে। শহর যখন, নিশ্চয়ই সেখানে থানা টানা আছে,

আর থানা তো হোম ডিপার্টমেণ্টেরই অধীনে। অনুপম চাইলে সেখানকার থানায় যোগাযোগ করে এক ঘণ্টার ভেতর মল্লিদের খবর, যদি ওরা ওখানে থাকে, বার করে নিতে পারবেন। অবশ্য মল্লিদের কথা তিনি অনুপমকে ঘুণাক্ষরেও জানাবেন না, শুধু আনন্দপুর শহরটা সম্পর্কে জানতে চাইবেন। জায়গাটা কেমন, সেখানে কিভাবে যেতে হয়, হোটেল টোটেল আছে কিনা, ইত্যাদি। কিন্তু ডায়াল করতে গিয়ে থমকে যান হিরণ্ময়। আনন্দপুর সম্পর্কে তাঁর কেন এত কৌতূহল, নিশ্চয়ই তা জানতে চাইবেন অনুপম। বেড়াতে যাচ্ছি বলে পার পাওয়া যাবে না। পশ্চিম বাংলায় এত ভাল ভাল জায়গা থাকতে আনন্দপুরের মতো তুচ্ছ শহরে বেড়াতে যাওয়াটা বিস্ময়কর নয় কী? পুলিশের জেরাটা একটু অন্য ধাঁচের। হাজার গণ্ডা কৈফিয়ত দিতে হবে অনুপমকে। কোন কথার মারপ্যাঁচে বিজলী আর মল্লির ব্যাপারটা বেরিয়ে পড়বে, কে জানে। রমলার সঙ্গে অনুপমের ভালই আলাপ আছে, রমলা তাঁকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। অনুপমকে তিনি যা বলবেন স্ত্রীর কানে সেটা পৌঁছুতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। অবশ্য অনুপমকে অনুরোধ করা যেতে পারে, তাঁদের মধ্যে যে কথা হবে সেটা যেন গোপন থাকে কিন্তু তাতে অন্য কিছু ভাবতে পারেন অনুপম। নিজের অস্বস্তিকর অতীত নিয়ে প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে আলোচনা করাটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

ফোনটা নামিয়ে রেখে হিরণ্ময় ঘরের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে থাকেন, অন্য কোনোভাবে আনন্দপুরের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা।

আনন্দপুর যখন শহর, কাছাকাছি রেল স্টেশন থাকার সম্ভাবনা। হিরণ্ময় জানেন এক মালদা ছাড়া নর্থ বেঙ্গলের বাকি অংশটা নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়েতে পড়ে। কলকাতায় সাউথ ইস্টার্ন আর ইস্টার্ন রেলওয়ের হেড কোয়ার্টার। এখানকার এনকোয়ারিতে একবার ফোন করে দেখলে হয়। এক রেল আরেক রেলের খবর জানলেও জানতে পারে। না জানলে অন্য উপায়ে আনন্দ-পুরের সন্ধান করতে হবে।

দ্বিতীয় বার ফোনটা করতে যাবেন, বাধা পড়ে। রমলা ডাক্তার

মজুমদারকে নিয়ে ঘরে ঢোকেন। টিপু আর পলাও তাঁদের সঙ্গে এসেছে।

রমলার এই এক স্বভাব, একটা কিছু মাথায় ঢুকলে তৎক্ষণাৎ সেটি করে ফেলা চাই। খানিক আগে ই সি জি'র কথা বলেছিলেন, তারপর দেড় ঘণ্টাও কাটেনি, ডাক্তার এনে হাজির করে ফেলেছেন।

ডাক্তার মজুমদার নাম-করা হার্ট স্পেশালিস্ট। এত তাড়াতাড়ি তাঁর অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া যায় না। তবে সম্পর্কে তিনি রমলার কাকা, তার ওপর হিরণ্ময় বিখ্যাত মানুষ এবং তাঁর জীবন যথেষ্ট মূল্যবান—নিশ্চয়ই এই সব কারণে ফোন করামাত্র ছুটে এসেছেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই ই সি জি শেষ করে হিরণ্ময়কে একটু বকাবকি করেন ডাক্তার মজুমদার। খুড়শ্বশুর হিসেবে এটুকু তিনি করতেই পারেন! হার্ট পেশেন্টের যে একসঙ্গে আট কিলোমিটার হাঁটা উচিত হয় নি এবং ভবিষ্যতে হিরণ্ময় যাতে এমন হঠকারিতা আর করে না বসেন সে সম্পর্কে বার বার সাবধান করে দিয়ে আজকের দিনটা পুরো বিশ্রাম নিতে বলেন। ই সি জি রিপোর্টে বড় রকমের গোলমাল অবশ্য পাওয়া যায় না। তবু ভবিষ্যতের কথা ভেবে হিরণ্ময়কে কোনোরকম ঝুঁকি নিতে বারণ করা হয়। টেনসান বা মানসিক উৎকণ্ঠা তাঁর পক্ষে যতটা বিপজ্জনক ঠিক ততটাই ক্ষতিকর মাত্রাছাড়া আবেগ।

বাধ্য ছেলের মতো হিরণ্ময় মাথা হেলিয়ে জানান, ডাক্তার মজুমদার যা পরামর্শ দিয়েছেন অক্ষরে অক্ষরে তা মেনে চলবেন। কিন্তু রমলার সঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়ে এবং ডাক্তার কাকাটি বেরিয়ে যাওয়ামাত্র টেলিফোন ডাইরেক্টরি থেকে রেলওয়ে এনকোয়ারির নাম্বার বার করে ডায়াল করতে থাকেন।

একবারেই লাইন পাওয়া যায়। ওধার থেকে এক মহিলার গলা ভেসে আসে, 'গুড ডে, দিস ইজ রেলওয়ে এনকোয়ারি।'

হিরণ্ময় বলেন, 'গুড ডে, একটা ইনফরমেসন চাইছি।'

'বলুন—'

হিরণ্ময় জানতে চান তিনি নর্থবেঙ্গলের আনন্দপুর যাবেন, সেখানকার ট্রেন কখন কোন স্টেশন থেকে ছাড়ে, পেঁছুতে কতক্ষণ

লাগে, দু-একদিনের ভেতর সেখানকার রিজার্ভেসন পাওয়া যাবে কিনা, ইত্যাদি।

মহিলা বলেন, 'ওয়ান মিনিট প্লিজ—' খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর ফের তাঁর গলা শোনা যায়, 'সরি স্যর, আনন্দপুর নামে একটা শহর নর্থবেঙ্গলে আছে ঠিকই, তবে সেখানে ট্রেন যায় না।'

হিরণ্ময় খানিকটা দমে যান। জিজ্ঞেস করেন, 'কিভাবে সেখানে যাওয়া যায় বলতে পারেন—'

বেশির ভাগ সময়ই দেখা যায় এ জাতীয় প্রশ্ন করলে এনকোয়ারির লোকেরা 'জানি না' বলে লাইন কেটে দেয়। কিন্তু মহিলা সত্যিই ভাল, অনেক রকম খবরও রাখেন এবং সবচেয়ে যেটা বড় ব্যাপার তা হল, যাত্রীদের আন্তরিকভাবেই সাহায্য করতে চান। তিনি বলেন, 'শুনেছি এসপ্ল্যানেডের বাস টারমিনাস থেকে গভর্ণমেন্টের লাক্সারি বাস আনন্দপুরে যায়। একটা প্রাইভেট কোম্পানিও ওই রুটে বাস চালায়। ওখানে খোঁজ করতে পারেন। আচ্ছা নমস্কার।'

আস্তে আস্তে ফোনটা নামিয়ে রাখেন হিরণ্ময়। দীর্ঘকাল পর কলকাতায় এসেছেন। এ শহরে তাঁকে আগন্তুকই বলা যায়। এসপ্ল্যানেডের কোথায় বাস টারমিনাস তিনি জানেন না। শুধু কলকাতা কেন, যে দিল্লীতে এতকাল কাটিয়ে এসেছেন সেখানকার বাস টারমিনাস সম্পর্কেও তাঁর ধারণা নেই। আসলে বাসে ওঠার তাঁর প্রয়োজন হয় না। দূরে কোথাও যেতে হলে হয় ট্রেন, নইলে প্লেন। শহরে ঘোরাঘুরির জন্য নিজস্ব 'কার' তো আছেই।

এখন সমস্যা হল, এসপ্ল্যানেডে গিয়ে আনন্দপুরের টিকিট কাটবেন কী করে? রমলারা তাঁর ওপর কড়া নজর রেখেছেন। বাড়িসুদ্ধ লোকের এত জোড়া চোখে ধুলো ছিটিয়ে বেরুনোও মুশকিল।

আবার উঠে পড়েন হিরণ্ময়। ঘরময় অস্থির পায়ে ঘুরতে ঘুরতে একসময় তাঁর মনে পড়ে যায়, কাল ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে একবার যেতে হবে। ভাইস চ্যান্সেলর তাঁর অনেক দিনের বন্ধু। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরো কয়েকটি বিষয় পড়ানোর জন্য ডিপার্টমেন্ট খুলতে চান। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন

নীতিগতভাবে এ ব্যাপারে টাকা দিতেও রাজী হয়েছে। এখন গোটা পরিকল্পনার একটা বিশদ রিপোর্ট তৈরির তোড়জোড় চলছে। এ বিষয়ে হিরণ্ময়ের মতো একজন বিখ্যাত অভিজ্ঞ মানুষের পরামর্শ তাঁরা চান।

আসলে গ্রান্টস কমিশনে এমন কিছু মেম্বার আছেন যাঁরা দিল্লী ইউনিভার্সিটিতে হিরণ্ময়ের কলীগ ছিলেন। বাকি ক'জনকেও তিনি ভালই চেনেন। এঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং প্রীতির। হিরণ্ময়কে যদি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোজেক্টের সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত করা যায়, গ্রান্ট পেতে সুবিধা হবে।

পরামর্শটা তাঁর ওল্ড বালিগঞ্জের বাড়িতে গিয়েও নেওয়া যেত কিন্তু প্রোজেক্ট রিপোর্টের কাজটা করছেন কয়েকজন এক্সপার্ট। কারুর কাজ আধাআধি হয়েছে, কারুর সিকি ভাগ, আবার কেউ সবে শুরু করেছেন। এই অবস্থায় পেপারগুলো নিয়ে যাওয়ার অসুবিধে আছে। হিরণ্ময়ের সঙ্গে কথা বলে এর অনেক কিছুই হয়তো বদলাতে হবে। প্রচুর লটবহর আর এত সব এক্সপার্টকে ওল্ড বালিগঞ্জে টেনে নিয়ে গেলে হিরণ্ময়কে বিব্রত করা হবে, কেননা তিনি সবে কলকাতার এসেছেন, এখনও ঠিকমতো গুছিয়ে বসতে পারেন নি। তার চেয়ে হিরণ্ময় ইউনিভার্সিটিতে এলে সব দিক থেকেই ভাল। ভাইস চ্যান্সেলর নিজে বাড়ি গিয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছেন। হিরণ্ময় সাগ্রহে যেতেও রাজী হয়েছেন। তার কারণ অনেক। প্রোজেক্টের ব্যাপারটা তো আছেই। তা ছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র তিনি। দিল্লীতে থাকতে এর সম্বন্ধে কাগজে নানা খবর চোখে পড়ত। অনেকের মুখে শুনেছেন, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি নাকি আন্দোলনের বিরাট সেন্টার হয়ে উঠেছে। এখানে পড়াশোনার পরিবেশ আর নেই। দীর্ঘকাল বাদে তাঁর প্রিয় পুরনো ইনস্টিটিউসন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তা দেখারও খুব ইচ্ছে হয়েছিল। খুব সম্ভব এক ধরনের নস্টালজিয়া তাঁকে যেন তাড়া করতে শুরু করেছিল।

হিরণ্ময় জানেন, বড় বড় থামওলা পুরনো মর্যাদাসম্পন্ন সেই সেনেট হল আর নেই। তার জায়গায় বাক্স প্যাটার্নের বৈশিষ্ট্যহীন খাড়া হাই-রাইজ উঠেছে। তবে আশুতোষ বিল্ডিং আছে,

দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং আছে, আছে কলেজ স্কোয়ার, কফি হাউস, পুরনো বইয়ের দোকান, পাবলিশার পাড়া। তা ছাড়া যাঁরা এক সময় তাঁর সঙ্গে পড়তেন তাঁদের কেউ কেউ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার, ইউনিভার্সিটিতে গেলে ওঁদের সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে। সেটা উপরি পাওনা।

ভাইস চ্যান্সেলর জানিয়েছেন, কাল তিনটেয় গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। বাড়ি পৌঁছে দেবার দায়িত্বও তাঁর।

হিরণ্ময় ঠিক করে ফেলেন, যেভাবেই হোক ইউনিভার্সিটিতে যাবার সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে। রমলা নিজে না হলেও টিপু বা পলা কাউকে সঙ্গে পাঠাতে চাইবেন কিন্তু কিছু একটা অছিলা খাড়া করে তিনি ওদের বাদ দিয়েই চলে যাবেন।

পরদিন কাঁটায় কাঁটায় তিনটেয় গাড়ি আসে। হিরণ্ময়কে নিয়ে যাবার জন্য ভাইস চ্যান্সেলর একজন লেকচারারকে পাঠিয়েছেন। তাঁর মতো এত বড় মাপের বিখ্যাত একজন মানুষকে নেবার জন্য সিনিয়র কাউকে পাঠানোর কথা। তরুণ লেকচারারটি জানালেন তিনিই নাকি উপাচার্যের কাছে একরকম কাকুতি মিনতি করে হিরণ্ময়কে নিয়ে যাবার এবং বাড়িতে পৌঁছে দেবার সুযোগটুকু আদায় করেছেন। উপাচার্য তাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, একটু খুঁত খুঁত করলেও শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছেন।

লেকচারারটির বক্তব্য হল, হিরণ্ময়ের মতো মানুষের সান্নিধ্যে আসতে পারা বিশাল সৌভাগ্যের ব্যাপার। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বাড়িতে এলে দু-পাঁচ মিনিটের বেশি কথা বলার তো সুযোগ মিলবে না। কেন না হিরণ্ময় বিরাট ব্যস্ত মানুষ। তাঁর সময় অত্যন্ত মূল্যবান, সেটা কারুর পক্ষে কোনো কারণেই নষ্ট করা ঠিক নয়। তাতে দেশেরই ক্ষতি।

ইউনিভার্সিটিতে আসা-যাওয়ার পথে যে ঘণ্টা দেড়েক হিরণ্ময়কে কাছে পাওয়া যাবে তরুণ লেকচারারটির জীবনে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর বেশ রসিকতাবোধ আছে। বলেন, 'যদি আজ বড় রকমের ট্র্যাফিক জ্যাম হয়, একটুও বিরক্ত হব না, ভাবব এটা গিফট অফ ফরচুন।'।

একটু অবাক হয়ে হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেন, 'কেন ?'

'তা হলে স্যার, আরো অনেকটা সময় আপনার সঙ্গে থাকতে পারব।'

মৃদু হেসে লেকচারারটিকে তাঁর পড়ার ঘরে বসিয়ে পোশাক বদলাবার জন্য বেডরুমে চলে আসেন হিরণ্ময়।

কমলা সেখানেই ছিলেন। স্বামীর জন্য লন্ড্রি থেকে আনা ধবধবে ট্রাউজার্স শার্ট ইত্যাদি বার করে অপেক্ষা করছিলেন। বলেন, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

ঠিক এটাই ভেবেছিলেন হিরণ্ময়। শার্ট টার্ট নিয়ে ঘরের কোণে কাঠের কারুকাজ-করা কাঠের নিচু পার্টিসানের আড়ালে চলে যান। ওখানে তাঁরা পোশাক পাল্টান। হিরণ্ময় বলেন, 'না না, তোমাকে যেতে হবে না। আই অ্যাম পারফেক্টলি অলরাইট। তা ছাড়া ওখানে আমরা কাজের কথা বলব, তুমি গেলে সবার অস্বস্তি হবে।'

রমলা বলেন, 'তোমরা যেখানে আলোচনা করবে সেখানে ঢুকব না। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তো আমি দেখি নি, এই অপরচুনিটিতে দেখা হয়ে যাবে। আমি চারদিকে ঘুরব, তারপর তোমার কাজ হয়ে গেলে একসঙ্গে ফিরে আসব।'

রমলা দিল্লীর মেয়ে, সেখানেই তাঁর জন্ম, পড়াশোনা। দিল্লী ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি এম. এ করেছেন। কলকাতায় বেশি আসেন নি, বড় জোর সাত-আটবার। হিরণ্ময় বলেন, 'না না, আজ থাক। তুমি গেলে ওঁরা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। আমাদের কাজের গোলমাল হয়ে যাবে। পরে একদিন যেয়ো।'

হিরণ্ময় যা বলেছেন তার শতকরা একশ ভাগ ঠিক। তাঁর আপ্যায়নের জন্য সবাই ছোটাছুটি শুরু করে দেবেন। যে উদ্দেশ্যে হিরণ্ময়কে নিয়ে যাওয়া সেটা পণ্ড হয়ে যাবে। খানিক চিন্তা করে রমলা বলেন, 'ইউনিভার্সিটিতে পেঁছে আমি গাড়িতে বসে থাকব। তুমি নেমে যাবার অনেকক্ষণ পর বেরুব। কেউ জানতেও পারবে না, আমি তোমার সঙ্গে এসেছি।'

হিরণ্ময় হেসে হেসে বলেন, 'যে ছেলেটি আমাকে নিতে এসেছে সে বোবাও নয়, অন্ধও নয়। সে দৌড়ে গিয়ে প্রথমেই ভাইস

চ্যান্সেলরকে তোমার আসার খবরটা দেবে।'

এরপর আর কিছু বলার থাকে না। গম্ভীর মুখে রমলা বলেন, 'ঠিক আছে, ভাইস চ্যান্সেলরকে কথা দিয়েছ বলে যেতে দিলাম। কিন্তু কোনোরকম বাড়াবাড়ি করবে না। তোমাকে ওষুধের শিশি দিচ্ছি। আনইজি ফীল করলে আধখানা ট্যাবলেট খেয়ে নেবে। ওখানে পে'ৗছেই আমাকে ফোন করবে।'

হার্ট অ্যাটাকটা হবার পর দিল্লীর ডাক্তাররা হিরণ্ময়কে সব সময়, বিশেষ করে বাড়ির বাইরে বেরুবার সময় সঙ্গে ওষুধ রাখতে বলেছেন। বুকে এতটুকু অস্বস্তি বা শ্বাসকষ্ট হলে আধখানা বড়ি ভেঙে জিভের তলায় রাখতে হয়। ডাক্তার মজুমদারও সেই পরামর্শই দিয়েছেন।

হিরণ্ময়ের ভয় ছিল রমলা যখন নিজে যেতে পারলেন না তখন হয়তো ছেলে বা মেয়েকে সঙ্গে দিতে চাইবেন কিন্তু এ ব্যাপারে কিছুই বললেন না। যাই হোক, এত তাড়াতাড়ি এবং এমন নির্বিঘ্নে ফাঁড়া কেটে যাবে, ভাবতে পারেন নি হিরণ্ময়। টেনসান কেটে যাওয়ায় তিনি আরাম বোধ করেন। বলেন, 'ওষুধের সঙ্গে শ পাঁচেক টাকা দিও তো।'

ভুরু কুঁচকে যায় রমলার। বলেন, 'যাবে তো ইউনিভার্সিটিতে। ওরা নিয়ে যাচ্ছে, পে'ৗছেও দেবে। এত টাকা দিয়ে কী করবে?'

'ওদিকে যখন যাচ্ছি, ক'টা বই কিনে আনব।'

সন্দিগ্ধভাবে স্বামীর দিকে তাকান রমলা। বলেন, 'তুমি কি আবার বইয়ের দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াবে?' হিরণ্ময়ের কাছ থেকে তিনি আগেই জেনেছিলেন কলেজ স্ট্রীট এরিয়ায় প্রেসিডেন্সি কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, ইউনিভার্সিটি যেমন আছে তেমনি ওটা বইপাড়ায়ও। পৃথিবীর আর কোথাও নাকি এক জায়গায় এত পাবলিশিং কনসার্ন নেই।

হিরণ্ময় শশব্যস্তে বলে ওঠেন, 'আরে না না, আমি যাব কেন? কাউকে পাঠিয়ে কিনিয়ে আনব।'

'ঠিক তো?'

'ওই দেখ, আমাকে তুমি দেখছি বিশ্বাস করছ না।'

'কাল যা কান্ড করে এলে তাতে তোমাকে আর বিশ্বাস নেই।'

বেরুবার সময় একটা পলথিনের ব্যাগে ছোট তোয়ালে, ফোটানো জলের বোতল, ওষুধের শিশি, সব গুছিয়ে বার বার সাবধান করে দেন রমলা। লিফট ছাড়া সিঁড়ি ভেঙে হিরণ্ময় যেন ওপরে না ওঠেন, সামান্য অস্বস্তি হওয়ামাত্র যেন ওষুধ খান, বাইরের জল যেন ভুলেও না ছোঁন আর আলোচনা শেষ হলেই যেন সোজা বাড়ি ফিরে আসেন।

স্ত্রীর প্রতিটি সতর্কবাণীতে সুবোধ বালকের মতো সায় দিয়ে তরুণ লেকচারারটির সঙ্গে একসময় বেরিয়ে পড়েন হিরণ্ময়।

লেকচারারটির নাম অরুণাভ সান্যাল। ইউনিভার্সিটির দিকে যেতে যেতে এমন স্তাবকতা তিনি শুরু করেন যে মুখ টুখ লাল হয়ে ওঠে হিরণ্ময়ের। তোষামুদে লোক তিনি আগে যথেষ্ট দেখেছেন কিন্তু অরুণাভর বোধহয় তুলনা নেই। হিরণ্ময় বুঝতে পারেন, জোর করে অরুণাভর তাঁকে নিতে আসা এবং চাটুকারিতা অকারণে নয়। নিশ্চয়ই এর পেছনে গভীর কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। কখন তার পেটের ভেতর থেকে তা বেরিয়ে আসে সেটাই এখন লক্ষ্য করার।

অরুণাভ অনবরত বকে চলেছেন। জানালার বাইরে তাকিয়ে নিজেকে অন্যমনস্ক রাখতে চেষ্টা করেন হিরণ্ময়।

এটুই বাচোয়া, আজ রাস্তা একেবারে পরিষ্কার। কোথাও ট্র্যাফিক জ্যাম নেই। তাড়াতাড়িই ইউনিভার্সিটিতে পেঁছনো যাবে। অর্থাৎ খুব বেশিক্ষণ এই বকবকায়মান যুবকটির সঙ্গলাভ করতে হবে না।

গাড়িটা গুরুসদয় রোড হয়ে আপার সার্কুলার রোডে এসে পড়েছিল। এবার ডান দিকে ঘুরে ক্যামাক স্ট্রীট, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, ওয়েলেসলি স্ট্রীট হয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এটাই ইউনিভার্সিটিতে যাবার সব চেয়ে সোজা রুট।

একনাগাড়ে অরুণাভর বকর বকর শুনতে শুনতে কান ঝালা-পালা হয়ে গিয়েছিল। এবার আনন্দপুর যাবার বাসের টিকিটটার কথা মনে পড়ে যায় হিরণ্ময়ের। মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'আপনাদের একটু কষ্ট দেবো। এসপ্ল্যানেডে আমার একটু কাজ আছে।

অনুগ্রহ করে যদি গাড়িটা ময়দানের দিক দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যান—'

অরুণাভ শশব্যস্তে বলে ওঠেন, 'এতে আবার কষ্ট কী স্যার, আপনি যা বলবেন তাই করা হবে।' ড্রাইভারকে গাড়িটা এসপ্ল্যানেডের দিকে নিয়ে যেতে বলেন তিনি।

গ্র্যান্ড হোটেলের কাছে এসে হিরণ্ময় বলেন, 'এখানে থামাতে বলুন।' গাড়ি থামলে দরজা খুলে নামতে নামতে বলেন, 'কয়েক মিনিটের কাজ, যাব আর আসব। আপনারা একটু ওয়েট করুন।'

হিরণ্ময় এভাবে এত দ্রুত নেমে যাবেন, ভাবতে পারেন নি অরুণাভ। তিনি ব্যাকুলভাবে বলেন, 'স্যার, আপনি গাড়িতে বসুন। আমাকে দিয়ে কাজটা হলে দয়া করে—'

বাসের টিকিটের কথা বললেই কেটে এনে দেবে অরুণাভ। কিন্তু তিনি কোথায় যাচ্ছেন তার সাক্ষী রাখতে চান না হিরণ্ময়। অরুণাভর কথার মাঝখানেই বলে ওঠেন, 'না না, অন্য কাউকে দিয়ে হবে না, আমাকেই করতে হবে।' বলে আর দাঁড়ান না। বাঁ পাশে ফুটপাথ ঘেঁষে কার পার্কিং জোন, সেখানে অজস্র গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হিরণ্ময় দ্রুত সেগুলোর পেছনে চলে যান।

ময়দান মার্কেটটা চেনা ছিল। সেখানে আসতে অস্পষ্টভাবে হিরণ্ময়ের মনে পড়ে মার্কেটের বাঁ ধার থেকে অনেকদিন আগে কিছু কিছু বাস ছাড়ত। এসপ্ল্যানেডের বাস টারমিনাসটা ওখানে হলেও হতে পারে। তাঁর ধারণাটা যে সঠিক, দু-একজনকে জিজ্ঞেস করতেই পরিষ্কার হয়ে গেল।

টারমিনাসে এসে পুরনো স্মৃতির সঙ্গে জায়গাটাকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন হিরণ্ময়। চব্বিশ পঁচিশ বছর আগে এখানকার একটা সরু রাস্তায় হাড় জিরজিরে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত। স্টার্টারের হুইসিল বাজলেই লম্বা-চওড়া শিখ ড্রাইভার একের পর এক গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়ে চলে যেত। সেই সব বাসের বডি আর ইঞ্জিন যে কোন মান্ধাতার বাপের আমলের, কে জানে! স্টার্ট দিলেই গাড়িগুলো মৃগী রুগীর

মতো প্রচণ্ড কাঁপতে থাকত। তারপর বিকট আওয়াজে এসপ্ল্যানেড এরিয়ার কানে তালা ধরিয়ে গলগল করে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে উধাও হয়ে যেত।

এখন টারমিনাসটা আর সেই চেহারায় নেই, অনেক পাল্টে গেছে। কংক্রিট ঢেলে অসংখ্য লেন বানিয়ে এখান থেকে প্রাইভেট এবং স্টেট বাস ছাড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। শহরের ভেতরকার রুটের নয়, লং ডিসটান্স রুটের লাক্সারি বাসও এখান থেকে ছাড়ে। তাছাড়া অন্য স্টেটের ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের বাসও এখানে এসে থামে এবং এখান থেকে ফিরে যায়।

নানা চেহারার অগুনতি বাস এধারে ওধারে দাঁড়িয়ে আছে। আর রয়েছে কয়েক হাজার মানুষ, বাসে ওঠার জন্য তারা লম্বা লম্বা 'কিউ'তে অপেক্ষা করছে।

কলকাতার অন্য সব জায়গার মতো এখানেও হকারদের অবাধ রাজত্ব। একধারে সারি সারি তেরপলের শেড বানিয়ে শস্তা রেডিমেড জামা-প্যান্ট, ফ্রক-ব্লাউজ আর শাড়ির দোকান। টারমিনাসে যেখানে যতটুকু ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেছে—চা-ওলা, কাটা ফলওলা, ভুট্টাওলা, ফুচকা আর ভেলপুরিওলারা একেবারে জমজমাট আসর বসিয়ে দিয়েছে। এধারে ওধারে যার সেখানে ইচ্ছা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করছে। ঝাঁঝালো তরল স্রোত বয়ে যাচ্ছে চারপাশে। এমন ওপেন-এয়ার মূত্রাঙ্গন পৃথিবীর আর কোনো বড় শহরে দেখা যাবে কিনা সন্দেহ।

দীর্ঘকাল দিল্লীর ছিমছাম পরিচ্ছন্ন পরিবেশে কাটিয়ে এসেছেন হিরন্ময়। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। মনে হয় আরেক বার স্ট্রোক হয়ে যাবে।

যাই হোক, আনন্দপুরের টিকিট কাউন্টারটা খুঁজে বার করতে খুব একটা কষ্ট করতে হয় না। দু'দিন পরের একখানা টিকিট কেটে মিনিট দশেকের ভেতর হিরন্ময় আবার গ্র্যান্ড হোটেলের উল্টোদিকে কার পার্কিং জোনে ফিরে এসে ইউনিভার্সিটির সেই গাড়িটায় উঠে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার স্টার্ট দেয়।

অরুণাভ উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন। কী উদ্দেশ্যে হিরন্ময়ের মতো একজন মানুষ ময়দান মার্কেটের মতো ঘিঞ্জ বাজারের দিকে

গিয়েছিলেন তা জানার জন্য ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল তাঁর কিন্তু সরাসরি এ নিয়ে তো আর প্রশ্ন করা যায় না। শুধু বলেন, 'কাজটা হয়েছে স্যার?'

অরুণাভর দিকে তাকাতে পারছিলেন না হিরণ্ময়। তাকালেই যেন ধরা পড়ে যাবেন, সেই ভয়ে জানালার বাইরে মুখ ফিরিয়ে আবছা গলায় বলেন, 'হ্যাঁ।'

অরুণাভর হয়তো ধারণা ছিল, এসপ্ল্যানেডে কী কারণে নেমে ছিলেন সেটা জানাবেন হিরণ্ময়। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে এত সংক্ষিপ্ত উত্তর পেয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না।

গাড়ি ধর্মতলা স্ট্রীট পার হয়ে স্টেটসম্যান অফিস ডান পাশে রেখে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ ধরে সোজা এগিয়ে যায়।

হিরণ্ময় ভাবছিলেন, আনন্দপুর যাওয়ার ব্যাপারে প্রথম কাজ অর্থাৎ টিকেট কাটা হয়ে গেছে। এখনও অনেক কিছু বাকি। হার্ডল কি একটা? এক জামা-প্যান্টে সেখানে যাওয়া যায় না। সুটকেশ দরকার। দু-চার সেট পোশাক, ওষুধ, শেভিং বক্স ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিস সেই সুটকেশে গুছিয়ে নিতে হবে। তা ছাড়া যেটা সব চেয়ে জরুরি তা হল নগদ কিছু টাকা।

বাড়ির সবাই তাঁর ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখছে। তাদের চোখের সামনে দিয়ে সুটকেশ নিয়ে বেরুনো অসম্ভব। কীভাবে, কোন কৌশলে বেরুবেন, সেটা ভাবতে হবে। অবশ্য তার জন্য পুরো দুটো দিন হাতে আছে।

পাশ থেকে অরুণাভ খুব আস্তে ডাকেন, 'স্যার—'

মুখ ফিরিয়ে হিরণ্ময় বলেন, 'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ স্যার।'

হিরণ্ময় তাকিয়ে থাকেন।

অরুণাভ বলেন, 'আপনার একটু ফেভার চাই স্যার। শুনেছি অনেককে জীবনে দাঁড়াতে সাহায্য করেছেন। আপনার সামান্য একটা রেকমেণ্ডশনে আমার কাজটা হয়ে যাবে। সমস্ত জীবন আমি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব স্যার।' বলে হাত কচলাতে থাকেন।

ঠিক এই রকমই কিছু আন্দাজ করেছিলেন হিরণ্ময়। বিনা উদ্দেশ্যে অরুণাভ ভাইস চ্যান্সেলরের হাতে পায়ে ধরে তাঁকে নিতে

এসেছেন এটা তাঁর কখনও মনে হয় নি। স্থির চোখে অরুণাভকে লক্ষ করতে করতে জিজ্ঞেস করেন, 'কী ধরনের সাহায্য আমার কাছে আশা করেন?'

হাত কচলানো চলছিলই। বিগলিত ভঙ্গিতে অরুণাভ বলেন, 'আমি জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে পড়াবার জন্যে অ্যাপ্লাই করেছি। আমি জানি আপনি দয়া করে ওখানকার অথরিটিকে যদি একটা ফোন করে দেন—'

অরুণাভর রেজাল্ট কেমন ছিল, তিনি কেমন পড়ান, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই হিরণ্ময়ের। এগুলো না জানলে কোনো রকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে সম্ভব নয়, তা বলতে গিয়ে বিদ্যুৎচমকের মতো একটা পরিকল্পনা মাথায় এসে যায় তাঁর। তিনি সাহায্য করতে চান, এটা বুঝতে পারলে অরুণাভকে যা বলবেন তিনি তাই করবেন। আনন্দপুর যাওয়ার ব্যাপারে এঁকে কাজে লাগানো যেতে পারে। হিরণ্ময় বলেন, 'আপনার বায়ো-ডাটা আর অ্যাপ্লিকেশনের ডেটটা আমাকে দেবেন। দেখি কী করা যায়।'

অরুণাভ কী করবেন কী বলবেন, ভেবে পান না। হাতজোড় করে গলে পড়তে পড়তে বলেন, 'নিশ্চয়ই স্যার, আমি কালই দিয়ে আসব।'

চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউর মাঝখান বরাবর বিশাল গর্ত খুঁড়ে পাতাল রেলের কাজ চলছে। চারিদিকে স্তূপাকার লোহা-লক্কড়, পাইলিং মেশিন, ক্রেন ইত্যাদি। দু'ধারের সরু লেন দিয়ে বাস মিনিবাস ট্রাক প্রাইভেট কার কচ্ছপের গতিতে এগিয়ে চলেছে।

গ্র্যান্ড হোটেলের কাছ থেকে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস বিল্ডিং পর্যন্ত আসতে হিরণ্ময়দের লাগে আধ ঘণ্টা, যেটা কিনা তিন মিনিটে আসা উচিত। বাড়তি যে সময়টা লাগল তা নিয়ে ভাবছেন না হিরণ্ময়। চোখের কোণ দিয়ে অরুণাভকে লক্ষ করতে থাকেন। অরুণাভ তাঁর আর্জি পেশ করেছেন, এবার নিজের কথাটা তাঁকে জানানো যেতে পারে।

হিরণ্ময় বলেন, 'আমার একটা অনুরোধ আছে—'

'অনুরোধ কী বলছেন, আদেশ করুন স্যার।'

'আমার ছোট্ট একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'কী করতে হবে বলুন স্যার।' নিঃশ্বাস বন্ধ করে উদ্‌গ্রীব তাকিয়ে থাকেন অরুণাভ।

একটু চিন্তা করে হিরণ্ময় বলেন, 'ব্যাপারটা কিন্তু গোপন রাখতে হবে।'

তৎক্ষণাৎ ঘাড় হেলিয়ে সায় দেন অরুণাভ, 'নিশ্চয়ই স্যার, আমার কাছ থেকে কেউ কিচ্ছু জানতে পারবে না।'

একটু চুপচাপ।

তারপর হিরণ্ময় বলেন, 'আপনি কোথায় থাকেন?'

অরুণাভর চোখের পাতা পড়ছিল না। তিনি বলেন, 'ভবানীপুরে হরিশ মুখার্জি রোডে, মিত্র স্কুলের কাছে।'

'বাড়িতে ফোন আছে?'

'আছে স্যার। নাম্বারটা লিখে দেবো?'

'পরে নেবো। এখন কাজের কথাটা শুনুন। ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার সময় আপনি আমার সঙ্গে আসছেন তো?'

'নিশ্চযই স্যাব। আপনাকে আমিই বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাব।'

'তখন আপনাকে তিনটে বেয়ারার চেক দেবো। টাকাটা কালই তুলবেন। কিছু জিনিস কিনতে হবে, তার একটা লিস্টও দেবো। লিস্ট মিলিয়ে সেগুলো কিনবেন। কেনাকাটার পর যে বাকি টাকা থাকবে আর জিনিসগুলো আপনার কাছে রেখে দেবেন।'

এভাবে তাঁকে দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলানো এবং জিনিস কেনাবার কারণ মাথায় ঢোকে না অরুণাভর। এই সামান্য কাজ যে কেউ করে দিতে পারত। এ ব্যাপারে এত গোপনীয়তারই বা কী আছে! বিমূঢ়ের মতো অরুণাভ বলেন, 'কিন্তু স্যার—'

'যা বললাম সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করা চলবে না। যদি আপনার পক্ষে সম্ভব না হয় বলুন। আমি কিছু মনে করব না।'

হিরণ্ময় যদিও বললেন মনে করবেন না, অরুণাভ বুঝতে পারেন তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে থাকবেন। জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটির চাকরিটা যখন অনেকখানি হিরণ্ময়ের ওপর নির্ভর

করছে তখন তাঁকে অসন্তুষ্ট করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। দম- আটকানো গলায় অরুণাভ বলেন, 'আমার কোনো প্রশ্ন নেই স্যার। আপনি যা বলবেন ঠিক তাই করব।'

'ধন্যবাদ।'

ইউনিভার্সিটিতে এসে সোজা ভাইস চ্যান্সেলরের চেম্বারে গেলেন না হিরন্ময়। অরুণাভকে সঙ্গে করে নস্টালজিয়ার ঘোরে কিছুক্ষণ দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং আশুতোষ বিল্ডিংয়ে ঘুরে বেড়ালেন। তাঁর ছাত্রজীবনের অতি মূল্যবান দু'টি বছর কেটেছে এখানে। পুরনো দিনের স্মৃতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

চল্লিশ বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশটাই ছিল অন্যরকম। যেদিকেই তাকানো যেত সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই ইউনিভার্সিটি ছিল প্রাইড অফ দি ইস্ট—প্রাচ্যের অহংকার। এখানকার মর্যাদা আর পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য সর্বক্ষণ সবাই তটস্থ থাকত। কেউ গলা চড়িয়ে কথা বলত না, শব্দ করে হাঁটত না। তখনও ছাত্রছাত্রী এত বেশি না থাকলেও যথেষ্টই ছিল। তারা দল বেঁধে এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে যেত, আড্ডা দিত, গল্প করত। মাঝে মাঝে নানা ছাত্র সংগঠন ইউনিভার্সিটি কম্পাউন্ডের ভেতর মিটিং ডেকে বক্তৃতা দিত কিন্তু কোথাও কোনোরকম বিশৃঙ্খলা ছিল না। তখনকার আবহাওয়া ছিল শান্ত, টেনসানমুক্ত।

আর এখন? চারিদিকে তাকিয়ে মন খারাপ হয়ে যায় হিরন্ময়ের। কতকাল বিল্ডিংগুলোতে রং পড়ে নি কে জানে! সব ম্যাড়মেড়ে, কালচে। প্রতিটি দেওয়ালে, ভেতরে কি বাইরে, ছাত্রদের এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের নানা দাবি-দাওয়ার কথা বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে। অসংখ্য পোস্টার এখানে ওখানে সাঁটা রয়েছে। চারপাশে পানের পিক, ধুলো, সিগারেটের টুকরো। যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, হইচই, চিৎকার, ডিসিপ্লিনের চিহ্নমাত্র নেই। এখন লাউড স্পিকার চালিয়ে কিসের একটা মিটিং চলছে নিচের কম্পাউন্ডে। আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যাবে যেন। এখানে পড়াশোনা হয় কী করে।

বিদেশের কথা বাদই দেওয়া যাক, দিল্লী, আমেদাবাদ, ভোপাল

বা দক্ষিণ ভারতের ইউনিভার্সিটিগুলোতে গেলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয় সে সব জায়গায় লেখাপড়া ছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভব নয়। আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে?

দূর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যা শুনেছিলেন, কাগজে যা পড়েছিলেন, দেখা যাচ্ছে তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়।

অনেকখানি নৈরাশ্য নিয়ে একসময় ভাইস চ্যান্সেলরের চেম্বারে আসেন হিরণ্ময়।

সিনিয়র অধ্যাপক, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, রেজিস্ট্রার থেকে শুরু করে টপ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসাররা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এঁদের অনেককেই আগে থেকে চিনতেন হিরণ্ময়, অচেনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ভাইস চ্যান্সেলর।

কিছুক্ষণ নানারকম গল্পটল্প হয়। প্রধান বক্তা অবশ্য হিরণ্ময়। চার দশক আগে যে দুটো বছর তিনি এখানে পড়াশোনা করেছেন তার স্মৃতিচারণ করতে করতে বার বার পুরনো দিনে ফিরে যাচ্ছিলেন তিনি। কোন কোন অধ্যাপক কিরকম পড়াতেন, কার কেমন মুদ্রাদোষ ছিল, তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে কারা কীভাবে মাস্টারমশাইদের সঙ্গে দুষ্টুমি করত, প্রায় অভিনয় করে তার খুঁটিনাটি বিবরণ দিতে খুব ভাল লাগছিল হিরণ্ময়ের। শ্রোতারাও খুব হাসছিলেন, আবার অবাকও হচ্ছিলেন। একজন বিখ্যাত গম্ভীর মানুষ যে এমন মজার মজার কথা বলতে পারেন, এ যেন ভাবা যায় না। আসলে হিরণ্ময়ের আপাত গাম্ভীর্যের খোলসের ভেতর একটি সরস পরিহাস-প্রিয় মানুষ লুকিয়ে রয়েছে।

হাল্কা চালে গল্প করতে করতে ঘণ্টাখানেক কেটে যায়। তার-পর যে উদ্দেশ্যে হিরণ্ময়কে এখানে আমন্ত্রণ জানানো সেই কাজটা শুরু হয়।

ভাইস চ্যান্সেলরের সামনে অনেকগুলো ফাইল রয়েছে। ইউনিভার্সিটির উন্নয়নের জন্য যে সব পরিকল্পনা করা হয়েছে তার একটা আউট লাইন জানিয়ে দেন তিনি। বলার ফাঁকে ফাঁকে ফাইল দেখে নানারকম তথ্য এবং স্ট্যাটিসটিকসও দেন।

সব শুনে হিরণ্ময় ভাইস চ্যান্সেলরকে বলেন, 'তোমাদের সমস্ত ব্যাপারটা প্রাইমারি স্টেজে রয়েছে। এর ওপর মন্তব্য করা ঠিক

নয়। একটা কাজ করতে পারো—'

ভাইস চ্যান্সেলর জিজ্ঞেস করেন, 'কী?'

'পুরো প্রোজেক্টটা সংক্ষেপে টাইপ করে আমাকে পাঠিও। ডিটেলের দরকার নেই। তবে কোন ডিপার্টমেন্টের জন্য কী করতে চাইছ সে সব যেন থাকে। ভাল করে সেটা পড়ি। তারপর গ্রান্টস পেতে কী কী করা দরকার সে সব আলোচনা করা যাবে।'

'সেই ভাল।'

অন্য সবাই এতে সায় দেন।

ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, 'এটা ভাই তোমারও ইউনিভার্সিটি। দেখো গ্রান্টস যেন পাওয়া যায়।'

উত্তর না দিয়ে সামান্য হাসেন হিরণ্ময়।

বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনটেয়। যাতায়াতে সময় লেগেছে ঘণ্টাখানেক। ইউনিভার্সিটিতে থেকেছেন দু ঘণ্টা। তিন ঘণ্টা বাদে ঠিক ছ'টায় ওল্ড বালিগঞ্জের বাড়িতে ফিরে আসেন হিরণ্ময়।

দোতলার নিজের পড়ার ঘরে অরুণাভকে বসিয়ে প্রচণ্ড টেনসান নিয়ে হিরণ্ময় বেডরুমে আসেন। স্টিলের আলমারিতে তিনটে ব্যাঙ্কের চেক বই রয়েছে। সেগুলো বার করাটাই সমস্যা। তিনি ফেটালিস্ট নন কিন্তু ভাগ্য বলে যদি কিছু থাকে সেটা আগাগোড়া আজ তাঁকে সাহায্য করছে।

ঘরে রমলা নেই। অ্যাটাচড বাথরুমে জল পড়ার একটানা শব্দ হচ্ছে অর্থাৎ রমলা এখন সেখানে। শীত-গ্রীষ্ম বার মাস এই সময়টা তিনি রোজই স্নান করেন। একবার বাথরুমে ঢুকলে এক ঘণ্টার আগে বেরোন না।

আলমারির চাবি থাকে খাটে, বালিশের নিচে। খুব সন্তর্পণে একটুও শব্দ না করে চাবি নিয়ে আলমারি খুলে চেক বই বার করেন হিরণ্ময়, তিন ব্যাঙ্কের তিনটি চেকের পাতা ছিঁড়ে দ্রুত আলমারি বন্ধ করে ফেলেন। তারপর পা টিপে টিপে সোজা নিজের পড়ার ঘরে।

নিজের চেক বইয়ের শীট চুরি করে আনতে সমস্ত শরীর ভীষণ

কাঁপছিল হিরণ্ময়ের। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ারে বসে ধাতস্থ হয়ে নেন। তারপর প্রথমে চেক লিখে, একটা বড় সাদা কাগজে খস খস করে লিখতে থাকেন—পাঁচ ফিট ছ' ইঞ্চি হাইটের একজন অ্যাভারেজ স্বাস্থ্যের লোকের জন্য দুটো করে ট্রাউজার্স, বুশ শার্ট, জাঙিয়া, গেঞ্জি, রুমাল। সেই সঙ্গে শেভিং বক্স, টুথ ব্রাশ, তোয়ালে, আফটার শেভ লোশন, ইত্যাদি। ওষুধের নামগুলো আর লেখেন না, দু'দিন পর যখন তিনি আনন্দপুর যাবেন বলে ঠিক করেছেন, রাস্তায় বেরিয়ে সেদিন নিজেই কিনে নেবেন।

লেখা হয়ে গেলে চেক আর জিনিসের লিস্টটা অরুণাভকে দেন হিরণ্ময়। বলেন, 'কালই ওগুলো কিনে ফেলবেন।'

তালিকাটার ওপর চোখ বুলিয়ে বিভ্রান্তের মতো অরুণাভ বলেন, 'আচ্ছা স্যার।' বলে এমনভাবে হিরণ্ময়ের দিকে তাকান যাতে মনে হয় এই বিখ্যাত, পন্ডিত মানুষটির মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কেই যেন প্রচন্ড সন্দিহন হয়ে পড়েছেন।

হিরণ্ময় এবার বলেন, 'আপনার ঠিকানা আর ফোন নাম্বার লিখে দিন।'

এক টুকরো কাগজে সব লিখে দেন অরুণাভ। এক পলক সেটা দেখে টেবলের ড্রয়ারে রেখে দেন হিরণ্ময়। সেই সঙ্গে আনন্দপুর যাবার বাসের টিকিটখানাও।

সীতা চা আর মিষ্টি দিয়ে যায়। এ বাড়িতে যে যখনই আসুক, এভাবে আপ্যায়ন করার নিয়ম। সেজন্য বার বার চা-মিষ্টির কথা বলার দরকার নেই। সে কিচেন থেকে হিরণ্ময়ের সঙ্গে অরুণাভকে আসতে দেখেছিল।

চা খেতে খেতে হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেন, 'সকালের দিকে আপনি কতক্ষণ বাড়িতে থাকেন?'

অরুণাভ জানাল, আপাতত বারটার আগে কোনোদিনই ইউ-নিভার্সিটিতে তাঁর ক্লাস নেই। এগারটা পর্যন্ত বাড়িতে অবশ্যই তাঁকে পাওয়া যায়।

হিরণ্ময় বলেন, 'আর বিকেলের দিকে?'

'ছ'টা নাগাদ ফিরে আসি। তারপর বিশেষ কাজ না থাকলে আর বেরুই না।'

'জানা রইল। কাল সন্ধ্যেবেলায় আমি একবার ফোন করব।'

'কাল সকালে আমি তো বায়ো-ডাটাটা দিতে আসছি।'

হিরণ্ময় বলেন, 'কিন্তু সকালে এলে চেক ভাঙানো, জিনিসপত্র কেনাকাটা – এসব তো জানা যাবে না।'

'কাজগুলো হয়ে গেলে আমি আপনাকে জানিয়ে দেবো। কষ্ট করে আপনি—'

অরুণাভকে থামিয়ে দিয়ে হিরণ্ময় বলেন, 'কলকাতার টেলিফোনের যা হাল তাতে গ্যারান্টি দিয়ে কিছু বলা যায় না। আমরা বরং দু'দিক থেকে চেষ্টা করব। যে পেয়ে যায়—'

অরুণাভ বলে, 'সেই ভাল স্যার।'

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অরুণাভ উঠে পড়েন, 'আজ চলি স্যার। আপনাকে নতুন করে বলার কিছু নেই। তবু জওহরলাল ইউনিভার্সিটির কথাটা দয়া করে মনে রাখবেন।'

লোকটা অত্যন্ত ঘ্যানঘেনে টাইপের। এক কথা অনবরত বললে অন্যেরা যে বিরক্ত হয় সেটা বোঝার শক্তি বোধহয় ওর নেই। হিরণ্ময় খুব সংক্ষেপে জবাব দেন, 'রাখব।'

অরুণাভ চলে যান।

ফাঁকা ঘরে মল্লির চিন্তাটা আবার হিরণ্ময়কে অস্থির করে তোলে। মাঝখানের দু'দিন যদি মেয়েটার ফোন না আসে, আনন্দপুর যাওয়াটা তাঁর একরকম অবধারিত। তার তোড়জোড়ও তিনি শুরু করে দিয়েছেন।

আনন্দপুরে তো যাবেন কিন্তু সেটা কত বড় শহর সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই হিরণ্ময়ের। জানাজানির ভয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করারও উপায় নেই। যদি ধরেও নেওয়া যায় ছোট শহর, একটা মেয়ের ডাক নাম দিয়ে তাকে খুঁজে বার করবেন কী করে?

পায়ের আওয়াজে চমকে ওঠেন হিরণ্ময়। টেবলের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন, মুখ তুলতেই দেখতে পান দরজা দিয়ে রমলা এ ঘরে ঢুকছেন। মুহূর্তে মল্লির চিন্তাটা মাথা থেকে মুছে যায়। বেশ নার্ভাস বোধ করতে থাকেন তিনি।

রমলা সোজা এসে হিরণ্ময়ের মুখোমুখি বসেন। বলেন, 'সীতার কাছে শুনলাম তুমি ফিরে এসেছ।'

স্ত্রীকে সতর্ক চোখে লক্ষ করেন হিরন্ময়। না, রমলা কিছুই টের পান নি। পেলে ঘরে ঢুকে তুলকালাম কান্ড বাধিয়ে দিতেন। তবু বুকের ভেতর একটানা ঢাক বাজার মতো তুমুল শব্দ হতে থাকে।

হিরণ্ময় বলেন, 'তুমি তখন বাথরুমে ছিলে।'

'হ্যাঁ।' রমলা বলেন, 'ইউনিভার্সিটিতে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হল?'

'হয়েছে।' হিরণ্ময় প্রাণপণে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করছেন, যেন কোনোভাবেই ধরা না পড়ে যান। রমলা অসাধারণ বুদ্ধিমতী, স্বামীর মুখচোখ দেখে তাঁর মনের ভেতর কী চলছে পলকে তা বুঝে ফেলেন। বলেন, 'অনেকদিন পর ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগল। পুরনো দিনের প্রচুর গল্প টল্প হল। তবে ইউনিভার্সিটিতে ঘুরে যা মনে হল, অ্যাটমসফীয়ার আগের মতো নেই। চূড়ান্ত ইনডিসিপ্লিন চলছে চারদিকে।' বলতে বলতে তাঁর মনে হল, অনেক বেশি কথা বলছেন। এমনি তো তিনি খুব স্বল্পবাক, কিন্তু নার্ভাসনেসটা কাটাবার জন্য রীতিমত প্রগলভ হয়ে উঠেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে রমলার ধারণা ভাসা ভাসা। আগে পরিবেশ কেমন ছিল, সে সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছেন। এখন তার কতটা অবনতি ঘটেছে তা নিয়ে খুব একটা ঔৎসুক্য দেখালেন না। চিন্তিতভাবে বলেন, 'ঘুরে ঘুরে যখন দেখেছ, নিশ্চয়ই সিঁড়ি ভেঙে বার বার ওঠানামা করতে হয়েছে।'

রমলা কী ইঙ্গিত দিচ্ছেন, বুঝতে অসুবিধা হয় না হিরণ্ময়ের। একবার যাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে তাঁর পক্ষে বেশি সিঁড়ি ভাঙা ভীষণ ক্ষতিকর। তিনি চকিত হয়ে বলেন, 'না না, লিফটে করে উঠেছি, নেমেছি।'

'ঠিক তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। নিজের হেলথের কন্ডিশান আমি জানি না!'

'জানলেই ভাল।' রমলা বলেন, 'আসল কাজের কী হল?'

হিরন্ময় বলেন, 'কোন কাজটা?'

'যে জন্যে তোমাকে ভাইস চ্যান্সেলর এত খাতির করে লোক পাঠিয়ে নিয়ে গেলেন সেই ইউ জি সি'র গ্রান্টের ব্যাপারে কী হল?'

'প্রিলিমিনারি একটা আলোচনা হয়েছে। পরে নানা প্রোজেক্ট নিয়ে আলাদা করে এক্সপার্টদের সঙ্গে বসতে হবে। সে জন্য সময় লাগবে।'

রমলার চোখ সব দিকে। কোনো কিছুই তিনি ভোলেন না। বলেন, 'বই কিনেছ?'

একটু অবাক হয়েই হিরণ্ময় বলেন, 'কিসের বই?'

'বা রে, টাকা নিয়ে গেলে, বললে বই কিনবে—'

এবার মনে পড়ে যায়। হিরণ্ময় বলেন, 'কেনা আর হল কই? কথায় কথায় দেরি হয়ে গেল। তাই কাউকে আর বই পাড়াতে পাঠানো হয় নি।' বলেই তাঁর খেয়াল হয় ইউনিভার্সিটিতে যাবার সময় রমলা যে পাঁচশ'টা টাকা দিয়েছিলেন, হয়তো তার হিসেব চাইতে পারেন। ওই টাকা থেকে আনন্দপুরের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। রমলা এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই চোখকান বুজে বলে ওঠেন, 'অ্যাডভান্স করার জন্য কিছু টাকা ইউনিভার্সিটির একজনকে দিয়ে এসেছি।'

মিথ্যে বলা এমনই এক প্রক্রিয়া যা একবার শুরু হলে সহজে আর তা থামতে চায় না, নিজের ঝোঁকেই এগিয়ে চলে। হিরণ্ময় বলতে থাকেন, 'দু-একদিনের মধ্যেই ভদ্রলোক বাড়িতে বই পাঠিয়ে দেবেন।'

রমলা এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেন না, একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান, 'ওখানে কিছু খাও নি তো?'

টাকার ব্যাপারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রমলা যে আর কিছু জানতে চাইলেন না, এতে আরাম বোধ করেন হিরণ্ময়। বলেন, 'শুধু এক কাপ চা আর দু'খানা নোনতা বিস্কুট খেয়েছি।' তাঁর এই কথাটার মধ্যে মিথ্যের ভেজাল নেই।

হিরণ্ময় যে তাঁর যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা সুবোধ বালকের মতো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন, এতে খুশিই হন রমলা। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে রমলা বলেন 'খিদে পায় নি? এখন কি কিছু খাবে?'

অন্যদিন বিকেল কাটায় কাটায় পাঁচটায় এক কাপ ওভালটিন, মাখন-ছাড়া দু'খানা কড়কড়ে টোস্ট আর সামান্য কিছু ফল খান

হিরণ্ময়। ইউনিভার্সিটিতে প্রচুর কেক, প্যাস্ট্রি, সন্দেশ, কাজু বাদামের আয়োজন ছিল কিন্তু সে সব তিনি ছোঁন নি। বলেন, 'না, খুব একটা পায় নি।' আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছেন, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, ওখানকাব প্রোজেক্ট নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন কিন্তু মল্লির চিন্তাটা তাঁর মাথায় থেকেই গেছে। কখনও সচেতনভাবে প্রবল টেনসান বোধ করেছেন, আবার যখন অন্যের সঙ্গে গল্প টল্প করেছেন, নিজের অজান্তে সেটা তাঁর ওপর চাপ তৈরি করে গেছে। খিদের কথাটা সেভাবে মনেই পড়ে নি।

রমলা বলেন, 'প্রায় সাতটা বাজে। এখন কিছু খেলে ভাতের খিদেটা নষ্ট হয়ে যাবে। আজ তাড়াতাড়ি ডিনার দিয়ে দেবো। কিচেনে যাই, দেখি সীতা কী করছে।'

রমলা চলে যান।

টেনসানটা ফের চারপাশ থেকে হিরণ্ময়কে ঘিরে ধরে। তাঁর ওপর বাড়ির লোকেদের যে ধরনের নজরদারি শুরু হয়েছে তাতে ওদের এড়িয়ে দু'দিন পর কিভাবে এখান থেকে বেরিয়ে এসপ্ল্যানেডে গিয়ে আনন্দপুরের বাস ধরবেন সেই ছকটা আপাতত ঠিক করে ফেলা দরকার।

পাঁচ

দুটো দিন কেটে যায়।

রাতের ঘুম আর স্নান-খাওয়া ছাড়া বাকি সময়টা হিরণ্ময় সীমাহীন উৎকণ্ঠা নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন, যদি মল্লি ফোন করে এই আশায়। কিন্তু না, তার ফোন আসে নি।

এই দু'দিনে যা যা ঘটেছে তা মোটামুটি এইরকম। হিরণ্ময় যেদিন ইউনিভার্সিটি যান তার পরদিন অরুণাভ তাঁর বায়ো-ডাটা ইত্যাদি দিয়ে গেছেন। তারপর কাল ফোন করে জানিয়েছেন সেই তিনটে চেক ভাঙিয়ে কেনাকাটা শেষ করেছে। খরচ হয়েছে দু হাজার সাত শ টাকা। বাকি ছ হাজার তিন শ একটা প্যাকেটে পুরে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন।

হিরণ্ময় অরুণাভকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন, এই উপকার তিনি মনে রাখবেন।

এ দিকে দু'দিন বাড়ি থেকে বেরোন নি বলে হিরণ্ময়ের ওপর পাহারাদারিটা অনেকখানি শিথিল করা হয়েছে। রমলারা হয়তো ধরে নিয়েছেন একটা দিন কাউকে কিছু না জানিয়ে কয়েক কিলো-মিটার যে তিনি হাঁটাহাঁটি করেছিলেন সেটা নেহাতই ব্যতিক্রম। নইলে দীর্ঘকালের অভ্যাস বা নিয়ম ভাঙার আদৌ কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই।

আজ আনন্দপুরের টিকেট কাটা হয়েছে। বাস রাত সাড়ে সাতটায়। বিকেল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়ে প্রথমে অরুণাভর বাড়ি থেকে জামা-প্যান্ট বোঝাই সুটকেস আর টাকা নিতে হবে, তারপর যাবেন এসপ্ল্যানেডে। কিভাবে বাড়ি থেকে বেরুবেন এখনও তার নিশ্ছিদ্র পরিকল্পনা করে উঠতে পারেন নি।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর রোজকার মতো বারান্দায় বসে সূর্যোদয় দেখেছেন হিরণ্ময়। তারপর পড়ার ঘরে এসে ডিভানে শুয়ে চোখের ওপর দুই হাত আড়াআড়ি রেখে একের পর এক ছক কষতে শুরু করেছেন। একবার ভাবেন, সাড়ে চারটের পর কোনো এক সময় নিচের বাগানে নেমে যাবেন, গাছ ফুলটুল দেখবেন। ওখানে ঘোরাঘুরি করতে করতে যখন বুঝবেন কেউ তাঁকে লক্ষ করছে না, নিঃশব্দে গেট পেরিয়ে বাইরে চলে যাবেন। আবার ভাবেন, কাছাকাছি সানি পার্কে তাঁর এক পিসতুতো বোন মনোরমা ফ্ল্যাট কিনেছেন। দিল্লী থেকে হিরণ্ময়রা কলকাতা আসার পর ওঁরা বার দুই তাঁদের বাড়ি ঘুরে গেছেন, তাঁরাও একবার ওঁদের ওখানে গেছেন। রমলাকে বলে মনোরমাদের ফ্ল্যাটে যাবার নাম করে বেরুনো যায়। কিন্তু কৌশলগুলো কোনোটাই মনঃপূত হয় না। এগুলো খুবই ঠুনকো আর ছেলেমানুষী ব্যাপার। বাচ্চারা এভাবে মাকে ফাঁকি দিয়ে রাস্তায় বেরোয়, তাঁর মতো একজন বয়স্ক বিখ্যাত মানুষের পক্ষে এ সব শোভা পায় না।

দেখতে দেখতে বেলা চড়ে যায়। রোদের রং বদলাতে থাকে কিন্তু বাইরে বেরুবার জুতসই একটা কৌশল কিছুতেই মাথা

থেকে বার করতে পারেন না হিরণ্ময়। ফলে ভেতরে ভেতরে অস্থিরতা বেড়ে যায়।

এর মধ্যে একসময় সীতা এসে ব্রেকফাস্ট খাইয়ে যায়। তারও ঘণ্টাখানেক বাদে ন'টা বেজে যখন কুড়ি, ডান হাতের পাতায় চারটে চার রঙের চার সাইজের ট্যাবলেট আর বাঁ হাতে জলের গেলাস নিয়ে ঘরে ঢোকেন রমলা। ওষুধগুলো স্বামীর হাতে দিয়ে কাছে বসতে বসতে বলেন, 'খেয়ে নাও।'

ওষুধ খাওয়ার পর রমলা বলেন, 'এখন একবার গড়িয়াহাট যেতে পারবে?'

বেশ অবাক হয়ে হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেন, 'কেন বল তো?'

'বা রে, সেদিন চারটে ট্রাউজার্স অর্ডার দিয়ে এলে না? আজ ট্রায়াল দেওয়ার কথা। কাল তুমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ছিলে ডায়মণ্ড টেলার্স থেকে ফোন করেছিল।'

বিদ্যুৎচমকের মতো একটা আইডিয়া এবার মাথায় এসে যায় হিরণ্ময়ের। তিন দিন ধরে তিনি যে ফন্দিটা আবিষ্কার করতে চাইছিলেন এই মুহূর্তে সেটা পেয়ে গেছেন। বলেন, 'এখন, এই রোদে আর বেরুতে ইচ্ছে করছে না, বিকেলে যাব।'

রমলা বলেন, 'বিকেলে গাড়ি পাবে কী করে? পলা আর আমি বেরুব। পরশু তোমাকে বললাম না, আজ নিউ মার্কেট যাব। সবে কলকাতায় এসেছি, অনেক জিনিস কেনাকাটা করতে হবে।'

রমলারা যে আজ নিউ মার্কেটে যাবেন, এ খবরটা ভুলে যান নি হিরণ্ময়। গাড়িও যে পাওয়া যাবে না সেটাও জানেন। তিনি বলেন, 'তা হলে এক কাজ করা যাক, আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে ট্রায়াল দিয়ে আবার ওই ট্যাক্সিতেই ফিরে আসব।'

'সেই ভাল।'

সমস্যাটার এত সহজে সমাধান হয়ে যাবে ভাবতে পারেন নি হিরণ্ময়। এখন বেশ আরাম বোধ করেন তিনি।

রমলা আর দাঁড়ান না, বারান্দায় বেরিয়ে সোজা একতলার সিঁড়ির দিকে চলে যান।

এক দিকের দুশ্চিন্তা কেটেছে। এবার ধীরে ধীরে ফোনটা তুলে বোতাম টিপে অরুণাভকে ধরে ফেলেন হিরণ্ময়। বলেন, 'আমি

ঠিক সন্ধ্যে ছ'টায় আপনাদের বাড়ি আসছি। আমার সুটকেসটা রেডি করা আছে তো ?'

অরুণাভ বলেন, 'এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। তবে শুধু সুটকেসের জন্যে কষ্ট করে আসতে হবে না। আপনি বলেন তো আপনাদের বাড়ি পেঁৗছে দিয়ে আসতে পারি।'

হিরণ্ময় চমকে ওঠেন, 'না না, তার দরকার নেই। আমি নিজেই যাব।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'ছ'টার ভেতর ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরতে পারবেন তো ?'

'নিশ্চয়ই পারব। আপনি যদি বলেন, আজ আর ইউনিভার্সিটিতে যাব না।'

জে এন ইউ অর্থাৎ জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে কিছু একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে খুশি করার জন্য অরুণাভ না পারেন হেন কাজ নেই। কিন্তু ক্লাস ফাঁকি দেওয়া, সেটা ছাত্রই হোক আর অধ্যাপকই হোক—একেবারেই পছন্দ করেন না হিরন্ময়। এ ব্যাপারে তিনি কড়া ডিসিপ্লিনেরিয়ান। বলেন, 'না না, ক্লাস কামাই করবেন না। আচ্ছা, এখন ছাড়ছি।' বলে ফোনটা নামিয়ে রাখেন।

বেলা একটু পড়লে বাড়ির গাড়িতে পলাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন রমলা। তার আগে অন্তত আট-দশ বার হিরণ্ময়কে সতর্ক করে দিয়েছেন, তিনি যেন ট্রাউজার্সের ট্রায়াল দিয়েই বাড়ি ফিরে আসেন, খেয়ালের বশে আর কোথায়ও না যান। রমলা আরো বলেছেন, নিউ মার্কেট থেকে শপিং সেরে তাঁদের ফিরতে দেরি হবে। সীতাকে বলা আছে বিকেলের খাবার ঠিক সোয়া পাঁচটায় দিয়ে যাবে।

বাধ্য ছেলেব মতো স্ত্রীর প্রতিটি কথায় সায় দিয়েছেন হিরণ্ময়।

একটা টেনসান কেটেছে, কিন্তু আরো অজস্র দুশ্চিন্তা চারিদিক থেকে তাঁর স্নায়ুমণ্ডলে চাপ দিতে থাকে। সেদিন লাক্সারি বাসের টিকেট কাটার সময় হিরণ্ময় জেনে নিয়েছিলেন, বাসটা আনন্দপুরে ভোরবেলায় পেঁৗছে যাবে। ওখানে ভাল হোটেল আছে কিনা

জিজ্ঞেস করায় কাউণ্টারের ছোকরাটি বলেছিল সে কখনও আনন্দপুর যায় নি তবে জায়গাটা যখন শহর তখন সেখানে হোটেল-টোটেল থাকা স্বাভাবিক অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে ছোকরা তাঁকে এই খবরটা দিতে পারে নি।

একা একা সব রকম ব্যবস্থা করে কোথাও গিয়ে থাকার অভ্যাস দীর্ঘকাল নষ্ট হয়ে গেছে হিরণ্ময়ের। বাড়িতে থাকলে সকালের চা খাওয়া থেকে রাতে শুতে যাওয়া পর্যন্ত সব দিকে রমলার তীক্ষ্ণ নজর থাকে। ভোরে সীতা যে চা দিয়ে যায় তা-ও আগের দিন রাতে ডিনারের পর রমলা তাকে মনে করিয়ে দেন, যদিও তার কোনো প্রয়োজন নেই। কখন হিরণ্ময়ের কী দরকার সীতার সব মুখস্থ। তবু যে রমলা তাঁকে মনে করান সেটা নেহাতই অভ্যাসবশে। নিজের খাওয়া দাওয়া, পোশাক-আশাক, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছুর জন্য তিনি স্ত্রীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। বিদেশে বা দেশের মধ্যে অন্য কোথাও আমন্ত্রণ থাকলে উদ্যোক্তারাই তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া, হোটেলে থাকার ব্যবস্থা, সব কিছু করে থাকেন। কাজ শেষ হয়ে গেলে এমন কি হিরণ্ময়কে বাড়িতে পৌঁছে পর্যন্ত দিয়ে যান। এ নিয়ে তাঁকে এতটুকু মাথা ঘামাতে হয় না।

আনন্দপুর গিয়ে কোথায় জায়গা পাওয়া যাবে কে জানে। বাইরে গেলে হিরণ্ময়কে ফাইভ স্টার হোটেলে রাখা হয়। বহু বছর ধরে এতেই তিনি অভ্যস্ত। আনন্দপুর নামে সীমান্তের কাছে নগণ্য এক শহরে ফাইভ স্টার হোটেল নিশ্চয়ই নেই। যা আছে (আদৌ যদি থাকে) তার বন্দোবস্ত কেমন, এখান থেকে ধারণা করা অসম্ভব। তা ছাড়া কাছাকাছি একজন ডাক্তার থাকা জরুরি। হার্ট পেশেণ্টের কখন কী প্রবলেম দেখা দেবে আগে থেকে তো আর বোঝা যায় না। আনন্দপুরে ভাল হার্টের ডাক্তার পাওয়া যাবে কিনা সেটাও চিন্তার বিষয়।

হঠাৎ হিরণ্ময়ের মনে হয়, এখন আর এসব ভাবার মানে হয় না। টিকেট কাটা হয়ে গেছে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলাও হয়েছে, সুটকেসে প্যাণ্ট-শার্ট কিনে রেখেছেন অরুণাভ। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন আনন্দপুর যাবেন। যেতে তাঁকে হবেই।

কাঁটায় কাঁটায় সোয়া পাঁচটায় সীতা বিকেলের খাবার নিয়ে আসে। মেয়েটার এই একটা গুণ, সব কিছু যান্ত্রিক নিয়মে করে যায়। হিরণ্ময় লক্ষ করেছেন, সময়ের এতটুকু হেরফের হয় না সীতার।

তাড়াতাড়ি খাওয়া চুকিয়ে আলমারি থেকে প্রেসক্রিপসন বার করে বেরিয়ে পড়েন হিরণ্ময়।

বড় রাস্তায় এসে প্রথমে প্রেসক্রিপসন দেখিয়ে একটা দোকান থেকে দিন সাতেকের মতো ওষুধ কেনেন, তারপর ট্যাক্সি ধরে সোজা ভবানীপুরে, অরুণাভদের বাড়ি।

অরুণাভরা যে বনেদি বড়লোক সেটা তাঁদের বাড়ির চেহারা দেখলেই টের পাওয়া যায়। অনেকটা জায়গার মাঝখানে বিরাট বিরাট থামওলা তেতলাটা ভিক্টোরিয়ান যুগের আর্কিটেকচারের কথা মনে করিয়ে দেয়। মস্ত লোহার গেট থেকে নুড়ির রাস্তা একতলার লম্বা লম্বা সিঁড়ির দিকে চলে গেছে। তার দু'ধারে সারি সারি পাম গাছ, তারপর ফুলের বাগান। বাগানে যত্ন এবং পরিচর্যার ছাপ সুস্পষ্ট।

গেটে বিশাল গোঁফওলা দারোয়ান বসে ছিল। ট্যাক্সি থেকে নেমে তাকে অরুণাভর কথা বলতেই সে হিরণ্ময়কে সঙ্গে করে সোজা একতলায় তাঁর কাছে নিয়ে যায়। অরুণাভ নিচেই বড় ড্রইং রুমে হিরণ্ময়ের জন্য সুটকেস আর টাকার প্যাকেট নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

হিরণ্ময়কে দেখে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়িয়ে অরুণাভ বলেন, 'আসুন স্যার, বসুন বসুন। আমার কী সৌভাগ্য যে—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে হিরণ্ময় বলেন, 'আজ আর বসার সময় নেই। আমার জিনিসগুলো দিন।'

হাতজোড় করে অরুণাভ বলেন, 'প্রথম দিন আমাদের বাড়িতে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল। একটু চা—'

এবার তাঁকে শেষ করতে দেন না হিরণ্ময়। বলেন, 'চা আরেক দিন হবে। আমার খুব তাড়া আছে।'

অরুণাভ একটু হতাশ হন। বলেন, 'আচ্ছা স্যার, আপনাকে তাহলে আটকাবো না। কিন্তু কথা দিয়েছেন, দয়া করে আরেক দিন আসতে হবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আসব।' নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য দ্রুত বলে ওঠেন হিরণ্ময়।

কড়কড়ে কারেন্সি নোটের একটা প্যাকেট হিরণ্ময়কে দিয়ে অরুণাভ বলেন, 'আপনার সঙ্গে কি গাড়ি আছে ?'

'আছে।'

'চলুন স্যার, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।' ড্রইং রুমের একধারে নতুন একটা সুটকেস দাঁড় করানো ছিল, সেটা তুলে নিয়ে অরুণাভ দরজার দিকে পা বাড়ান।

হিরণ্ময় বিব্রত বোধ করেন। বল্লেন, 'এ কী! সুটকেসটা আপনি বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কেন ? আমাকে দিন।'

অনুনয়ের সুরে অরুণাভ বলেন, 'স্যার, আর হয়তো সুযোগ পাবো না। দয়া করে এটুকু সেবা আমাকে করতে দিন।'

লোকটা যে অত্যন্ত চতুর এবং প্রতিটি সুযোগ নিজের স্বার্থে কাজে লাগাবার জন্য ওত পেতে আছে, সেটা আগেই টের পেয়েছিলেন হিরণ্ময়। কেমন করে সুচারুভাবে তৈলমর্দন করতে হয়, এই লোকটার কাছে শেখা উচিত। চাটুকারিতাকে প্রায় শিল্পের পর্যায়ে তুলে এনেছে সে। ফের আপত্তি করলে বকবকানি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে, তাই চুপচাপ অরুণাভর সঙ্গে ড্রইংরুম থেকে সোজা রাস্তায় চলে আসেন হিরণ্ময়।

ট্যাক্সিটা ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। দরজা খুলে হিরণ্ময় বলেন, 'এবার সুটকেসটা দিন।' বলে হাত বাড়িয়ে দেন।

অবাক চোখে ট্যাক্সিটা লক্ষ করতে করতে বিমূঢ়ের মতো অরুণাভ বলেন, 'স্যার, আপনি ট্যাক্সি করে এসেছেন ?'

'হ্যাঁ।' সুটকেসটা নিতে নিতে হিরণ্ময় খুব সংক্ষেপে উত্তর দেন।

অরুণাভ কথা দিয়েছিলেন কোনোরকম প্রশ্ন করবেন না। নিজের অজান্তেই বুঝিবা খানিকটা ঔৎসুক্য প্রকাশ করে বসেন, 'আপনার গাড়ির কী হল ?'

'ওটায় করে আসার অসুবিধে ছিল।' বলতে বলতে ট্যাক্সিতে উঠে পড়েন হিরণ্ময়।

'স্যার, আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন ?'

হিরণ্ময় জবাব দেন না।

অরুণাভ ভীষণ নাছোড়বান্দা ধরনের মানুষ। আচমকা কিছু মনে হওয়ায় সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি যে এভাবে বেরিয়ে পড়েছেন, বাড়ির সবাই জানেন?'

হিরণ্ময় হকচকিয়ে যান। পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলেন, 'আপনার কৌতূহলটা একটু বেশি। অনুগ্রহ করে আর কোনো প্রশ্ন করবেন না।'

অরুণাভ সত্যি সত্যিই ঘাবড়ে যান। হাত কচলাতে কচলাতে বলেন, 'স্যার, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আর কিছু জানতে চাইব না।'

'আপনার সঙ্গে আগেই কিন্তু কথা হয়ে গেছে, সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রাখবেন। আশা করি বিশ্বাসের অমর্যাদা করবেন না।'

'না স্যার, কক্ষনো না।'

এবার ট্যাক্সিওলার দিকে ফিরে হিরণ্ময় বলেন, 'চলুন—'

ছয়

এসপ্ল্যানেডে পৌঁছুতে সোয়া ছ'টা বেজে যায়। বাস ছাড়তে এখনও অনেকটা দেরি।

হিরণ্ময় ভাবলেন, বাস টারমিনাসের নোংরা আবহাওয়ায় থিক-থিকে ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে না থেকে কাছাকাছি কোথাও একটু ফাঁকা মতো জায়গায় বসে সময়টা কাটিয়ে দেবেন। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে স্যুটকেস হাতে ঝুলিয়ে টারমিনাসের ডান পাশ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গান্ধীজির স্ট্যাচুর উল্টোদিকে সবুজ ঘাসের জমিতে এসে বসেন তিনি।

কিছুক্ষণ আগে অফিস ছুটি হয়েছে। যেদিকে চোখ যায়, অজস্র মানুষের ভিড়। সামনের রাস্তা দিয়ে অগুণতি গাড়ি রেড রোডের দিকে ছুটে চলেছে। বাঁ ধারে, খানিক দূরে চৌরঙ্গিতেও বাস, মিনিবাস, ডবল ডেকার, স্কুটারের স্রোত।

অন্যমনস্কের মতো চারপাশের দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে ঘণ্টাখানেক কেটে যায়। তারপর স্যুটকেস নিয়ে বাস টারমিনাসে এসে আনন্দপুরের বাসে উঠে বসেন হিরণ্ময়। সীটগুলো মোটামুটি আরামদায়ক। সারারাত কাটাতে হবে, তাই পেছন দিকে অনেকখানি হেলান দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। যে শহরে যেখানে কেউ নিয়ম, শৃঙ্খলা বা নিয়মানুবর্তিতার ধার ধারে না, সেখানে আনন্দপুরের বাস কিন্তু কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটাতেই ছেড়ে দিল।

মানুষের ভিড়, ট্রাফিকের জট ইত্যাদি পেরিয়ে শহরের বাইরে বেরুতে দেড় ঘণ্টা লেগে যায়। তবে দমদম এয়ারপোর্ট ছাড়াবার পর রাস্তা বেশ ফাঁকাই পাওয়া গেল। অবশ্য মাঝে মাঝে লরির কনভয় আসতে থাকে উল্টো দিক থেকে।

জানালার পাশে সীট পেয়েছিলেন হিরণ্ময়। তিনি বাইরে তাকিয়ে থাকেন। রাস্তার ধার ঘেঁষে প্রচুর গাছপালা, চাষের খেত, মাঝে মাঝে ছোট ছোট টাউন বা গ্রাম—সব কিছু ঝড়ের গতিতে পেছনে ফেলে লাক্সারি বাস ছুটে যাচ্ছে।

কোনোদিকেই লক্ষ নেই হিরণ্ময়ের। নাঃ, এই মুহূর্তে তিনি মল্লির কথা ভাবছেন না। আনন্দপুরে গিয়ে কোথায় উঠবেন, কিভাবে মল্লিকে খুঁজে বার করবেন, এ নিয়েও তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নন। সময়ের উজান ঠেলে হিরণ্ময় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর আগের দিনগুলিতে ফিরে যান। রাস্তার পাশের যাবতীয় দৃশ্য ঝাপসা হতে হতে তাঁর চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায়।

হিরণ্ময়ের জন্ম চেতলায়, রাখাল আড্ডি রোডে। তাঁর ঠাকুরদার বাবা তিন প্রজন্ম আগে সাদামাঠা তিন কামরার ছোট একখানা বাড়ি তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর ছেলেবেলা তো বটেই, যৌবনের অনেকটা অংশই কেটে গেছে। বাড়িটা ছোট হলেও চারপাশ ঘিরে জমি ছিল অনেকখানি, সব মিলিয়ে প্রায় দশ কাঠার মতো।

তাঁদের ছিল তিন জনের ছোট্ট ফ্যামিলি। মা, বাবা আর তিনি। আর কোনো ভাইবোন ছিল না হিরণ্ময়ের।

বাবা পোর্ট কমিশনার্সে ছোটখাট চাকরি করতেন। তখন সস্তাগণ্ডার দিন, তিনি যা মাইনে পেতেন তাতে তিনজনের সংসার মোটামুটি ভালই চলে যেত।

বাবা ছিলেন শান্ত, নির্বিরোধ মানুষ, কারুর সাতে পাঁচে থাকতেন না। অফিস ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। শখ বলতে ছুটির দিনে ঘনিষ্ঠ ক'টি বন্ধুর সঙ্গে তাসের আসর বসানো, মাঝে মধ্যে ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়া, মাঝে দু'একটা সিনেমা—ব্যস। এই ভাবেই ঢিমেতালে চাঞ্চল্যহীন জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিলেন।

মা ছিলেন ভীষণ চুপচাপ মানুষ। কথা বলতেন খুব কম। সারা বছরই একটা না একটা অসুখে ভুগতেন। রোগা অসুস্থ মানুষটিকে দেখামাত্র বোঝা যেত তাঁর জীবনীশক্তি খুব বেশি অবশিষ্ট নেই।

মায়ের অস্তিত্ব বিশেষ টের পাওয়া যেত না, শব্দহীন ছায়ার মতো এ ঘরে ও ঘরে ঘুরে সংসারের কাজ করে যেতেন।

হিরণ্ময় মা-বাবার শান্ত স্বভাবের প্রায় সবটাই পেয়েছিলেন। ছেলেবেলা থেকে দারুণ ইনট্রোভার্ট। ছাত্র হিসেবে অসাধারণ। নিজের লেখাপড়া ছাড়া আর কোনোদিকে তাঁর নজর ছিল না। খেলাধুলো সিনেমা—এসব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহবোধ করতেন না। সময় পেলেই চলে যেতেন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। বই ছাড়া আর কিছু বুঝতেন না।

ম্যাট্রিকুলেশনে সেকেণ্ড হয়েছিলেন হিরণ্ময়, ইণ্টারমিডিয়েটে ফার্স্ট, বি. এ-তে ইকোনমিক্স অনার্স নিয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

প্রতিটি পরীক্ষার পর খবরের কাগজের প্রথম পাতায় তাঁর ছবি বেরুত। গোটা চেতলায় তখন লোকজন খুব কম। ওখানকার জীবন ছিল প্রায় নিস্তরঙ্গ। কিন্তু ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টারমিডিয়েট বা বি. এ-র রেজাল্ট বেরুবার পর চেতলা, বিশেষ করে রাখাল আড্ডি রোড তোলপাড় হয়ে যেত। হিরণ্ময়কে নিয়ে এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের তখন দারুণ গর্ব।

মানুষ আজকের মতো তখন এত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে নি। সবাই সবাইকে চিনত, সুখে দুঃখে পাশে এসে দাঁড়াত। হিরণ্ময়ের রেজাল্ট বেরুলে রাখাল আড্ডি রোডের প্রতিটি লোক মিষ্টি কি

কেকের বাক্স বা নিজেদের তৈরি খাবার নিয়ে আসত। সব মিলিয়ে একটা উৎসবের ব্যাপার।

হিরণ্ময়ের মা-বাবা অভিভূত হয়ে যেতেন। সবাইকে সাধ্য-মতো আপ্যায়ন তো করতেনই, বলতেন হিরণ্ময় যে এত ভাল রেজাল্ট করে চলেছে, সেটা পাড়ার পাঁচজনের আশীর্বাদে।

হিরণ্ময় এত হইচইতে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়তেন। লোকের মুখে অনবরত প্রশংসা শুনে শুনে তাঁর কান লাল হয়ে উঠত। তবু পাড়ার লোকজন এলে তাদের সামনে দাঁড়াতে হত, বয়স্কদের প্রণাম করতে হত। সবাই যখন সুখ্যাতি করত, মুখ নামিয়ে লাজুক হাসতেন শুধু, কী বলবেন ভেবে পেতেন না।

মনে আছে, রেজাল্ট বেরুবার পর সবার আগে যাঁরা ছুটে আসতেন তাঁরা হলেন ব্রজরাখাল চক্রবর্তী এবং তাঁর মেয়ে বিজলীপ্রভা বা বিজলী।

পড়াশোনা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে ঔৎসুক্য না থাকলেও পাড়ার লোকেদের খবর রাখতেন হিরণ্ময়। ব্রজরাখালদের ফ্যামিলি তাঁদের চেয়েও ছোট। সব মিলিয়ে মোটে দু'টি মানুষ— তিনি আর বিজলী। বিজলীর মা অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন।

ব্রজরাখাল ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার। একমুখ খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাঁড়ি, তোবড়ানো গাল, উস্কখুস্ক চুল, রোগা হাড় বার-করা চেহারা, ঘোলাটে চোখে নিকেলের গোল বাই-ফোকল চশমা। পরনে আধময়লা মোটা ধুতির ওপর টুইলের হাফ-হাতা পাঞ্জাবি। 'জীবন সংগ্রাম' বলে একটা গাল-ভরা কথা আছে, ব্রজরাখালকে দেখলে সেই কথাটা মনে পড়ে যেত।

তখনকার দিনে প্রাইমারি স্কুলের মাস্টাররা ক'টা পয়সাই বা মাইনে পেত। নিজেদের পৈতৃক বাড়িটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। নেহাত ছোট সংসার, তাই টায়টোয় কোনোরকমে চালিয়ে নিতেন।

কিন্তু বিজলীকে দেখলে বোঝা যেত না তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, কিংবা ওই বাপের এই মেয়ে। তার দিকে তাকানো মাত্র চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে যেত। আগুনের মতো রূপ ছিল বিজলীর। টকটকে রং, চোখের নীল মণি, সরু ভুরু, ঈষৎ পুরু

ভেজা ভেজা ঠোঁট, পিঠ ছাপানো চুল, পাতলা কোমর। জোড়া পাহাড়ের মতো উদ্ধত স্তন ছিল বিজলীর, কোমরের তলায় ওল্টানো তানপুরার খোলের বিশাল অববাহিকা। তার চোখ এবং ভারী ঠোঁট থেকে যখন তখন রহস্যময় অশ্লীল হাসি চলকে পড়ত।

বিজলী সম্পর্কে নানা গুঞ্জন আবছাভাবে হিরণ্ময়ের কানে অনেক আগেই এসেছিল। পাড়ায় মেয়েটার একেবারেই সুনাম ছিল না। ভীষণ গায়ে-পড়া, রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিত, শরীর দুলিয়ে হি হি করে হাসত। মাঝে মাঝে এর ওর সঙ্গে তাকে ভবানীপুর কি চৌরঙ্গির সিনেমা হল-এও নাকি লোকে দেখা গেছে।

চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে সোসাইটি ছিল ভীষণ কনজার-ভেটিভ, এখনকার মতো ভেঙেচুরে ঢিলেঢালা হয়ে যায় নি। পাড়ার লোকেরা বিজলীর চালচলন হাবভাব একেবারেই পছন্দ করত না। সে আমলের সামাজিক স্ট্যাণ্ডার্ডে সবার চোখে সে ছিল বাজে মেয়ে।

ম্যাট্রিকটা কোনোরকমে পাশ করে বিজলী কলেজে ঢুকেছিল কিন্তু ইণ্টারমিডিয়েটটা খুব সম্ভব পেরুতে পারে নি। বার দুই ফেল করেছিল, তবে কলেজে নামটা লেখানো ছিল। রোজই খুব সাজগোজ করে কাঁধে লেডিজ ব্যাগ ঝুলিয়ে, হাতে বই আর বাঁধানো খাতা নিয়ে সে বেরুত। পাড়ার অনেকের ধারণা, বেশির ভাগ দিনই কলেজে যেত না বিজলী। কোথায় কোথায় কার সঙ্গে ঘুরে বেড়াত সে-ই শুধু জানত।

গোড়ায় বিজলীকে সেভাবে লক্ষ করেন নি হিরণ্ময়। নিজের রেজাল্ট, কেরিয়ার—এসব নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে অন্য কোনো-দিকে তাকানোর সময় ছিল না। তবে একই পাড়ায় থাকার জন্য স্বাভাবিকভাবেই রাস্তায় বেরুলে প্রায়ই দেখা হয়ে যেত। চোখা-চোখি হলে ঠোঁট কামড়ে নিঃশব্দে অদ্ভুত হাসত বিজলী। ভীষণ অস্বস্তিবোধ করতেন হিরণ্ময়, দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিতেন। ফেরালে কি হবে, বিজলীর হাসিটা বুকের ভেতর ছুরির ফলার মতো বিঁধে যেত। মেয়েটার এত দুর্নাম, তবু তার প্রতি তীব্র একটা আকর্ষণ বোধ করতেন হিরণ্ময়, মস্তিষ্কে নেশার ঘোর লাগত যেন।

মনে আছে, প্রথম দিকে রাস্তায় দেখা হলে কথাটথা বলত না বিজলী, শুধুই হাসত। কিন্তু হিরণ্ময় ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করার পর থেকে তার সাহস বেড়ে গিয়েছিল। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে এমন জনবিস্ফোরণ ঘটেনি। রাস্তায় এত লোকটোক দেখা যেত না। একটু ফাঁকায় পেয়ে বিজলী একদিন বলেছিল, 'ভাল রেজাল্ট করেছ বলে তোমার খুব গর্ব, তাই না ?'

হিরণ্ময় চমকে উঠেছেন, ঢোক গিলে বলেছেন, 'না না, গর্ব হবে কেন ?'

'তাহলে দেখা হলে আমার সঙ্গে কথা বল না যে ?'

'মানে—মানে—'

'মানে আবার কী ? আমি বাঘ না ভাল্লুক যে দেখলেই পালিয়ে যাও ? আমি কি তোমাকে টপ করে গিলে ফেলব ?'

ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন হিরণ্ময়। অন্য কেউ তাঁদের লক্ষ করছে কিনা, দেখার জন্য চারপাশে তাকাতে তাকাতে কাঁপা গলায় বলছেন, 'না—এই এই—' বলেই একরকম দৌড়ে পালিয়ে গেছেন।

পেছন থেকে বিজলীর চাপা গলা শোনা গিয়েছিল, 'ভীতুর ডিম। দেখি কতদিন পালাতে পারো ?'

আরেক দিন চেতলা ব্রিজের কাছে, বার্লি কলের সামনে বিজলীর মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলেন হিরণ্ময়।

বিজলী তার পুরু ঠোঁট আর চোখের নীল তারায় সেই চটুল হাসিটি ফুটিয়ে বলেছিল, 'আবার দেখা হয়ে গেল।'

হৃৎপিণ্ডটা পলকের জন্য থমকে গিয়ে পরক্ষণে প্রবল বেগে লাফাতে শুরু করেছিল। বুকের ধকধকানি এত বেড়ে গিয়েছিল যে মনে হয়েছে, হাজারটা অদৃশ্য ঘোড়া যেন সেখানে ছুটে যাচ্ছে। বিজলী সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ছিল বিচিত্র—তীব্র ভয়ের সঙ্গে প্রচণ্ড আকর্ষণ মেশানো। তার কথার কী উত্তর দেবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না হিরণ্ময়। তবে এটুকু টের পাওয়া যাচ্ছিল, শাবা শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছে।

বিজলী আরেকটু কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোথায় চললে ?'

ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করতে করতে হিরণ্ময় বলেছিলেন, 'এই কাছেই—'

'কাছে বলতে ?'

'সাদার্ণ এভিনিউতে, আমার এক বন্ধুর বাড়ি।'

'আড্ডা দিতে ?'

শশব্যস্তে হিরণ্ময় বলেছেন, 'না না, দুটো দরকারী বই আনতে যাচ্ছি।'

বিজলী চোখ ছোট করে বলেছে, 'বই বই বই ! দিনরাতই তো বইয়ে মুখ গুঁজে থাকো। এখন আর বন্ধুর বাড়ি যেতে হবে না।'

চারিদিকে তাকাতে তাকাতে শুকনো গলায় হিরণ্ময় বলেছেন, 'কিন্তু—'

'কিন্তু ফিন্তু নয়, চল না গঙ্গার ধার থেকে একটু বেড়িয়ে আসি।'

'না না—' বলেই সন্ত্রস্ত হিরণ্ময় বিজলীকে পাশ কাটিয়ে চেতলা ব্রিজের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগিয়েছিলেন।

বিজলী কিছু বলে নি, শুধু তার চোখের নীল তারাদুটো ধক ধক করে জ্বলে উঠেছে।

এই ভাবেই চলছিল।

হিরণ্ময়ের বি. এ'র রেজাল্টটা বেরুবার পর দুটো বড় বড় ঘটনা ঘটেছিল। এক, মায়ের মৃত্যু। দুই, বিজলীর বেপরোয়া হয়ে ওঠা।

মা হিরণ্ময়ের জীবনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ভীষণ ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। তখন সবে এম. এ'তে ভর্তি হয়েছেন। বেশ কিছুদিন ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারেন নি, সারাদিন তখন ঘরে শুয়ে থাকতেন আর অসহায় বালকের মতো কাঁদতেন।

এই সময়টা পাড়ার লোকেরা প্রায়ই আসত, তাঁকে বোঝাত—মা-বাবা চিরকাল থাকে না, জন্মালে মরতে হয়, জগতের এটাই অনিবার্য নিয়ম, ইত্যাদি।

ব্রজরাখালের সঙ্গে একদিন বিজলীও এসেছিল। অন্যের কান

বাঁচিয়ে চাপা গলায় সে বলছে, 'কাঁদে না, শরীর খারাপ হবে। মা গেছে তো কী, আমি তো আছি।'

চকিত হয়ে বিজলীর দিকে তাকিয়েছেন হিরণ্ময়। মেয়েটা কী ধরনের ইঙ্গিত করছে, বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন।

বিজলীর মুখে সেদিন নির্লজ্জ চটুল হাসিটা ছিল না। নিঃশব্দে একটা হাত বাড়িয়ে সে হিরণ্ময়ের কপালে রেখেছিল—হয়তো সহানুভূতি জানাতেই। সেই প্রথম স্পর্শে যাই থাক, হিরণ্ময়ের সমস্ত শরীরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো কিছু একটা ঘটে গিয়েছিল।

মনে পড়ে শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে যাবার পর খানিকটা সামলে উঠেছিলেন হিরণ্ময়। আবার ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ক্লাস করতে শুরু করেছিলেন। ছুটির দিনে আগের মতোই যেতেন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে, নানা বই থেকে পাতার পর পাতা নোট নিয়ে আসতেন।

মাসখানেক এভাবে কাটার পর একদিন দুপুরে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ছেন, হঠাৎ তাঁর পাশের চেয়ারে এসে কে যেন বসেছিল। ফাঁকা চেয়ার থাকলে কেউ না কেউ বই রিকুইজিসান করে এনে পড়তে বসে। তেমন কোনো পড়ুয়ার কথাই ভেবেছিলেন হিরণ্ময়। তাই মুখ তোলেন নি, নিজের বইয়ের পাতাতেই মগ্ন হয়ে ছিলেন।

কখন খেয়াল নেই, পাশ থেকে নিচু মেয়েলি গলা কানে এসেছিল, 'পৌনে দুটো বাজে। আর কতক্ষণ বসে থাকব?'

চমকে মুখ ফেরাতেই হিরণ্ময়ের চোখের তারা স্থির হয়ে গিয়েছিল। পাশে বসে আছে বিজলী।

বিস্ময়টা কাটিয়ে উঠতে বেশ কিছুটা সময় নেন হিরণ্ময়। তার পরেই যেটা তাঁর ওপর ভর করে তার নাম ভয়। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করেছেন, 'তুমি—তুমি এখানে?'

বিজলী বলেছে, 'রাস্তায় দেখা হলে তুমি পালিয়ে যাও। তোমাদের বাড়িতে যে যাব, সেখানে তোমার বাবা আছেন। তা ছাড়া পাড়ার লোকেরা সারাক্ষণ আমার ওপর চোখ রেখে বসে

আছে। তাই ভেবেচিন্তে এখানেই চলে এলাম। আর যাই হোক, লাইব্রেরিতে আমাদের দিকে কেউ তাকিয়ে থাকবে না।' একটু থেমে আবার বলেছে, 'গুড বয়, অনেক লেখাপড়া হয়েছে। এবার চটপট উঠে পড়।'

বিমূঢ়ের মতো হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেছেন, 'কেন?'

'আমার সঙ্গে যাবে।'

'কোথায়?'

'আমি যেখানে নিয়ে যাব। ওঠ, প্লিজ উঠে পড়।' কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখতে দেখতে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল বিজলী, 'হাতে বেশি সময় নেই। চল—'

বিজলীকে ইচ্ছা করলেই তাড়িয়ে দেওয়া যেত কিন্তু তা হলে চেঁচামেচি করতে হয়। তাতে ন্যাশনাল লাইব্রেরির পবিত্রতা এবং নৈঃশব্দ নষ্ট হবে, যারা পড়াশোনা করছিল বিরক্ত হবে, তাঁর নামে লাইব্রেরিয়ানের কাছে কমপ্লেন করবে। তা ছাড়া যেটা বড় ব্যাপার তা হল, হিরণ্ময় অত্যন্ত লাজুক এবং ভীরু ধরনের মানুষ। হইচই বাধাবার শক্তি বা সাহস কোনোটাই তাঁর নেই। অশান্তি উত্তেজনা —এ সবের সম্ভাবনা দেখলে ভয়ানক ঘাবড়ে যান। বিজলীকে চলে যেতে বললে সে আবার কী কাণ্ড বাধিয়ে বসবে কে জানে। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই যে বইটা পড়ছিলেন ফেরত দিয়ে বিজলীর সঙ্গে তাঁকে বেরিয়ে পড়তেই হয়।

মনে আছে, একটা ট্যাক্সি ডেকে বিজলী তাঁকে তুলে নিয়ে সোজা চলে গিয়েছিল এলিট সিনেমায়। আগেই তার আর হিরণ্ময়ের জন্য ম্যাটিনে শো'-এর দুখানা টিকেট কেটে রেখেছিল সে। ছবিটা ছিল হলিউডের—যেমন রোমান্টিক তেমনই সেক্সি। দুর্ধর্ষ চেহারার নায়িকা বিকিনি আর বুকে লুক-থ্রু ব্রা পরে প্রায় প্রতিটি দৃশ্যেই দেখা দিচ্ছিল। তার সঙ্গে আর যে সব যুবতী অভিনেত্রীরা ছিল তাদেরও একই পোশাক। হেসে গেয়ে নেচে লাফিয়ে আর নায়ককে প্রতিটি ডায়ালোগের পর জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে তারা একেবারে হুল্লোড় বাধিয়ে দিচ্ছিল। ছবিটার মধ্যে স্নান আর বৃষ্টিতে ভেজার দৃশ্য যে কত ছিল তার হিসেব নেই। অর্থাৎ যেভাবেই হোক শরীর দেখানোটাই আসল ব্যাপার।

এ জাতীয় ছবি দেখার অভ্যাস ছিল না হিরণ্ময়ের। আসলে সিনেমা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ প্রায় ছিলই না। তবু মাঝে মধ্যে দু-একটা বাংলা ছবি যে দেখতেন না তা নয়। অবশ্য টার্জন বা ওই জাতীয় জাঙ্গল পিকচার এলে দেখতে যেতেন।

যাই হোক, বিজলীর পাশে বসে রগরগে ছবিটা দেখতে দেখতে হিরণ্ময়ের মনে হচ্ছিল সিনেমার পর্দা থেকে সেক্সের হল্কা বেরিয়ে এসে তাঁর চোখমুখ ঝলসে দিচ্ছে। কানের লতি তাতানো লোহার পাতের মতো লাল হয়ে উঠেছিল। নাকের ভেতর থেকে গরম ভাপ বেরিয়ে আসছিল। আর তারই মধ্যে হিরণ্ময় টের পাচ্ছিলেন একটা উত্তপ্ত নরম হাত তাঁর একটা হাত আঁকড়ে ধরে আছে।

জীবনে কখনও সিগারেট খান নি হিরণ্ময়, তখন পর্যন্ত মদ ছোঁন নি (পরে অবশ্য বড় পার্টিতে এক আধ পেগ হুইস্কি খেতে হয়েছে) তবু অদ্ভুত এক নেশার ঘোরে মাথা ঝিম ঝিম করছিল। মাঝে মাঝে পর্দার নায়ক যখন নায়িকাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছিল, পাশ থেকে চাপা খসখসে গলায় বিজলী জিজ্ঞেস করেছে, 'কেমন লাগছে?'

হিরণ্ময় উত্তর দেন নি। নিজের হাতটা যে ছাড়িয়ে নেবেন সে শক্তিটুকুও আর অবশিষ্ট ছিল না তাঁর।

সেই শুরু। তারপর থেকে প্রতি রবিবার তাঁকে লাইব্রেরি থেকে টেনে নিয়ে যেত বিজলী। হয় চড়া সেক্সের ঝাঁঝওলা আমেরিকান সিনেমা দেখতে, নইলে ইডেন গার্ডেন কি গঙ্গার ধারে বা অন্য কোথায়ও।

রোজই হিরণ্ময় ভাবতেন আর নয়। বিজলীকে মুখের ওপর 'না' বলে দেবার মতো সাহস বা মনের জোর ছিল না তাঁর। ভাবতেন কিছুদিন লাইব্রেরিতে যাবেন না। কিন্তু রবিবার হলেই কখন যে অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে লাইব্রেরিতে চলে যেতেন, নিজেরই খেয়াল থাকত না। বিজলী যেন অদৃশ্য বঁড়শি তাঁর নাকে গেঁথে টেনে নিয়ে যেত। তীব্র নিষিদ্ধ এক নেশা তখন তাঁকে পেয়ে বসেছে।

মনে পড়ে, সিনেমা দেখে বা বেড়িয়ে টেড়িয়ে রেস্তোরাঁয় খেয়ে তাঁরা একসঙ্গে রাখাল আড্ডি রোডে ফিরতেন না। রাসবিহারীর

মোড় পর্যন্ত এসে আগে চলে যেত বিজলী। তার অনেকক্ষণ পর এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে সময় কাটিয়ে বাড়ি আসতেন হিরম্ময়।

ধীরে ধীরে বিজলী সম্পর্কে তাঁর ভয় এবং আড়ষ্টতা কেটে যাচ্ছিল। এভাবে লুকিয়ে চুরিয়ে মেলামেশা করাটা যে খুবই অন্যায় হচ্ছে, জানাজানি হয়ে গেলে রাখাল আড্ডি রোডের বাসিন্দাদের চোখে তিনি যে অনেকখানি নিচে নেমে যাবেন, এসব অজানা ছিল না হিরম্ময়ের। তবু ক্রমে তার মনে হচ্ছিল, এই নির্লজ্জ বেপরোয়া মেয়েটা যৌবনের নেশা-ধরানো গোপন এক সুগন্ধ তাঁর জীবনে ছড়িয়ে দিয়েছে। ওকে ছাড়া তাঁর চলবে না।

হিরম্ময় ছেলেবেলা থেকে খুবই সাদামাঠা। পোশাক-আশাক সাজসজ্জার দিকে কোনোদিনই তাঁর নজর ছিল না। বেশির ভাগ জামাতেই একটার বেশি বোতাম থাকত না। প্যাণ্ট ট্যাণ্ট ইস্ত্রির করাতে ভুলে যেতেন। চুল এলোমেলো, মুখে অল্প অল্প দাড়ি। পড়াশোনা ছাড়া সব ব্যাপারেই ছিলেন উদাসীন। এমনকি খাওয়ার কথাও অনেক সময় তাঁর মনে থাকত না। মা বেঁচে থাকতে তাড়া দিয়ে খাওয়াতেন। পরে বাবাকেও এই দায়িত্বটা নিতে হয়েছিল। নইলে অন্যমনস্ক নিস্পৃহ ছেলের খাওয়াই হবে না।

কিন্তু বিজলী ছিল একেবারে উল্টো ধাতের, তার উগ্র রঙচঙে সাজগোজ চোখ একেবারে ঝলসে দিত।

মনে পড়ে, বিজলীর সঙ্গে সেই যে লুকিয়ে সিনেমা দেখতে যেতেন, তখন থেকেই নিজের সম্বন্ধে মনোযোগী হয়ে উঠেছিল হিরণ্ময়। রোজ শেভ করতেন, ভাল করে চুল আঁচড়াতেন। জামার বোতামগুলো সঠিক জায়গায় থাকত, ইস্ত্রি-করা ধবধবে প্যাণ্ট সার্ট ছাড়া পরতেন না। জুতোয় থাকত চকচকে পালিশ। অর্থাৎ চেহারায় সাজসজ্জায় চাকচিক্য এসে গিয়েছিল হিরণ্ময়ের। দূরমনস্ক অগোছালো মানুষটির ভেতর থেকে এক সৌখিন যুবক ক্রমশ বেরিয়ে আসতে শুরু করেছিল।

মনে আছে বিজলী ছিল ভীষণ খরচে। ট্যাক্সি ছাড়া এক পা চলতে চাইত না, দামী রেস্তোরাঁয় চপ কাটলেট ছাড়া অন্য কিছু খেত না। হয়তো বেলুনওলার কাছ থেকে সব বেলুন কিনে

সুতোয় বেঁধে আকাশে উড়িয়ে দিল কিংবা ট্যাক্সিওলাকে ভাড়ার ওপর পাঁচ টাকা বকশিসই করে ফেলল। প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারের মেয়ে দু হাতে টাকা ওড়াবার মতো এত টাকা কোথায় পেত কে জানে।

প্রথম দিনকয়েক ট্যাক্সিভাড়া, সিনেমার টিকেটের দাম বা রেস্তোরাঁর বিল দিয়েছে বিজলী কিন্তু পরে আর তাকে খরচ করতে দিতেন না হিরন্ময়। একটা মেয়ে তাঁর জন্য টাকা খরচ করবে তা তো আর হয় না। এক ধরনের কমপ্লেক্স ভেতরে ভেতরে কাজ করতে শুরু করেছিল তাঁর। বাবা মাসের গোড়ায় হাত খরচের জন্য চল্লিশটা করে টাকা দিতেন। আগে তার প্রায় পুরোটা দিয়ে নানারকম বইটই কিনতেন হিরন্ময়। বিজলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর টাকাটার সদ্‌গতি হতে লাগল অন্যভাবে। কিন্তু সেই শস্তার বাজারেও বিজলীকে নিয়ে বেরুলে মাসিক বরাদ্দের চল্লিশটা টাকা দু'দিনেই উড়ে যেত। তাই ফি সপ্তাহেই বাবার কাছে হাত পাততে হত। বাবা কোনোদিন কোনো ব্যাপারেই তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতেন না, নিঃশব্দে টাকা দিয়ে দিতেন। নিয়মিত দিতে দিতে একদিন ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'জানি, তুমি অপব্যয় কর না, তবু এত টাকা দিয়ে কী হয়?'

চোখকান বুজে হিরন্ময় বলেছিলেন, 'বই আর ম্যাগাজিন কিনতে লাগে।' জীবনে সেই প্রথম বাবার কাছে তাঁর মিথ্যে বলা।

চুপচাপ কয়েক পলক তাকিয়ে থেকেছেন বাবা, আর কোনো প্রশ্ন করেন নি।

হিরন্ময় সেদিন ঠিক বুঝতে পারছিলেন না, বাবা কিছু সন্দেহ করেছেন কিনা। জীবনের প্রথম মিথ্যে মুখ দিয়ে বার করার পর ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছিল। এক ধরনের তীব্র পাপবোধ তাঁকে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছিল। যাবা চিরকাল তাঁকে বিশ্বাস করে এসেছেন আর তিনি কিনা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসলেন, এবং তা-ও একটা মেয়ের জন্য!

আত্মগ্লানিটা কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় নি। সেদিনই বিজলীর

সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সব ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। মেয়েটা বোধ হয় তুকতাক জানত। নইলে তাকে দেখামাত্র মাদকতাময় নেশার ঘোর কেন এসে লাগবে তাঁর মস্তিষ্কে?

নেশা যত উগ্রই হোক, হিরণ্ময়ের চরিত্র বরাবরই নিয়ম শৃঙ্খলা দিয়ে তৈরি। বিজলী সে সব খানিকটা আলগা করে দিলেও মোটামুটি তার ভিতটি তখনও অনেকখানি অটুট ছিল। টাকা ওড়ানোটা তিনি মনেপ্রাণে অপছন্দ করতেন, বিশেষ করে যে টাকাটা তাঁর কেরানী বাবাকে পোর্ট কমিশনারের অফিসে দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ঘাড় গুঁজে কলম পিষে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হত।

মাঝে মাঝে কুণ্ঠিত মুখে হিরন্ময় হয়তো বলতেন, 'আজ ট্যাক্সি থাক, ট্রামে করেই যাই চল।' কিংবা 'আজ রেস্তোরাঁয় যেতে ভাল লাগছে না, গড়ের মাঠে বসে মশলা মুড়ি খেতে খেতে গল্প করব।'

স্থির চোখে হিরন্ময়কে লক্ষ করত বিজলী। বলত, 'ভিখিরিদের মতো বেঁচে থাকতে আমার ইচ্ছে করে না।' ট্যাক্সি ডেকে জোর করে সে হিরন্ময়কে তুলে ফেলত, কি দামী রেস্তোরাঁয় টেনে নিয়ে যেত।

বিজলীর চরিত্রটা ক্রমশ ভাল করে বুঝতে পারছিলেন হিরন্ময়। মনে পড়ে একদিন সে বলেছিল, 'আমার কী ইচ্ছে করে জানো?'

হিরন্ময় বলেছিলেন, 'কী?'

'ভাল খাব, ভাল পরব, দামী মোটরে চড়ব, বড় বাড়িতে থাকব। এই না হলে বাঁচা!'

প্রাইমারি স্কুলের গরীব মাস্টারের এই মেয়েটা সারাক্ষণ যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর আরামের স্বপ্ন দেখে এবং এ সবের জন্য লালায়িত হয়ে থাকে, সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

আরেক দিন হঠাৎ বিজলী জিজ্ঞেস করেছিল, 'এত ভাল রেজাল্ট করছ। এম. এ পাশ করার পর নিশ্চয়ই অনেক বড় চাকরি পাবে। বিরাট মাইনে পাবে, তাই না?'

হিরন্ময় হেসে হেসে বলেছিলেন, 'আগে পাশ তো করি।'

বিজলী বলেছে, 'পাশ কী বলছ! তুমি ফার্স্ট হবে। চাকরি পাওয়ার পর কিন্তু নতুন গাড়ি কিনবে। চেতলা বাজে জায়গা,

বালিগঞ্জে একটা সুন্দর বাড়ি করা চাই, সামনে যেন বাগান আর ফোয়ারা থাকে।'

বিজলীর সঙ্গে মিশলেও লেখাপড়ার ব্যাপারে হিরন্ময় ছিলেন দারুণ সজাগ। একটুকু ফাঁকি দিতেন না, নিয়মিত ইউনিভার্সিটিতে যেতেন, ক্লাস নোট নিতেন, বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করতেন।

মনে আছে, এভাবে বছর দুই কাটার পর সবে তিনি এম. এ'র ফাইনালটা দিয়েছেন, সেই সময় তাঁর জীবন একটি ঘটনায় একেবারে ওলট পালট হয়ে গেল।

সেদিন ছিল ছুটির দিন। বাবা বাড়িতে তাসের আসর বসান নি। ব্যারাকপুরে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল, সকালে স্নান সেরে সেখানে চলে গেছেন। মা মারা যাবার পর ঘর-সংসার সামলাতে একটি মধ্যবয়সী বিধবাকে স্থায়ীভাবে রাখা হয়েছিল— নাম কমলা, হিরন্ময় তাকে কমলাদি বলতেন। সেদিন রান্নাবান্না সেরে হিরন্ময়কে খাইয়ে নিজে খেয়ে ঘণ্টা কয়েকের ছুটি নিয়ে দুপুরে সে গিয়েছিল টালিগঞ্জে তার এক বোনের সঙ্গে দেখা করতে, ফিরবে সন্ধেবেলায়। ততক্ষণ বাড়িতে একাই থাকবেন হিরন্ময়।

দিবানিদ্রার অভ্যাস একেবারেই ছিল না হিরন্ময়ের। তবু ছুটির দিন বাড়িতে থাকলে একটা বইটই নিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়তেন। কমলা বেরুবার পর সেদিনও তাই করেছিলেন। সেদিনের বইটা ছিল একটা ভ্রমণ কাহিনী। জিরি হ্যাঞ্জেলকা আর মিরোশ্লাভ জিকমুন্দ নামে দুই বন্ধু চব্বিশ বছর বয়সে আফ্রিকায় যান, সেখানে তাঁরা ছিলেন একটানা চোদ্দটি বছর। এর মধ্যে গোটা মহাদেশটির এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত দু'জনে কখনও মোটরে, কখনও পায়ে হেঁটে চষে বেড়ান। সেখানকার নদী, নিবিড় বনভূমি, হীরে আর তামার খনি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, জলপ্রপাত, নানা জাতের আদিম বাসিন্দা, ইওরোপিয়ানদের উড়ে এসে জুড়ে বসা, তাদের এক্সপ্লয়টেশন ইত্যাদি ব্যাপারে চোদ্দ বছরের বিপুল অভিজ্ঞতা নিয়ে দুই পর্যটক বন্ধু তিন ভলিউমে যে বইটি লিখেছেন তার নাম 'আফ্রিকা'। সেটা পড়তে পড়তে একেবারে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন হিরন্ময়। ইউরোপ আমেরিকা সম্বন্ধে বিস্তর বই পড়া ছিল কিন্তু

আফ্রিকা সম্পর্কে এমন দারুণ একখানা গ্রন্থ আগে তাঁর হাতে আসে নি।

কড়া নাড়ার খুট খুট আওয়াজ অনেকক্ষণ ধরে আবছাভাবে কানে আসছিল হিরণ্ময়ের কিন্তু 'আফ্রিকা' নামের বইটায় এমনই ডুবে ছিলেন যে প্রথমটা খেয়াল করেন নি। শব্দটা ক্রমশ বাড়ছিলই। একসময় চকিত হয়ে বিছানা থেকে নেমে তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে চলে যান হিরণ্ময়। কিন্তু বাবা বা কমলাদির তো এখন ফেরার কথা নয়। তা হলে কে আসতে পারে?

উঠোন পেরিয়ে সদর দরজা খুলতেই চমকে উঠেছেন হিরণ্ময়। সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছে বিজলী। কিছু বলার আগেই হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দিয়েছিল সে, অসহিষ্ণু গলায় বলেছে, 'কতক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছি, ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি?

আগে কখনও একা তাঁদের বাড়ি আসেনি বিজলী। তিন চার বার যা এসেছে তাও ব্রজরাখালকে সঙ্গে নিয়ে। হিরন্ময় এতটাই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন যে কী বলবেন ভেবে পান নি।

বিজলী এবার বলেছিল, 'কড়া নাড়ছি আর চারপাশে তাকাচ্ছি, এই বুঝি কেউ দেখে ফেললে। এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম।'

চমকানো ভাবটা কাটিয়ে আবছা কাঁপা গলায় হিরন্ময় কোনোরকমে বলতে পেরেছেন, 'একটা বই পড়ছিলাম, তাই—'

'আমাকে কি উঠোনে দাঁড় করিয়ে রাখবে? ঘরে যেতে বলবে না?'

মাত্রাছাড়া বিস্ময় তো ছিলই, এবার তার সঙ্গে ভয়ও মিশে যায়। ভীরু গলায় হিরন্ময় জিজ্ঞেস করেছেন, 'কিছু দরকার আছে?'

বিজলী বাঁ দিকের ভুরুটা সামান্য তুলে বলেছে, 'দরকার না থাকলে যেতে বলবে না?'

বিব্রত, দিশেহারা হিরণ্ময় বলছেন, 'না না, তা নয়। এস—' উঠোন পার হয়ে নিজের ঘরে এসে বিজলীকে তাঁর খাটের একধারে বসিয়ে আরেক ধারে জড়সড় হয়ে বসতে বসতে বলছেন, 'আমি কিন্তু বাড়িতে একলা আছি।'

বিজলীর ঠোঁটে এবং চোখের নীল তারায় সেই নির্লজ্জ

বেপরোয়া হাসিটি ফুটে উঠেছে। মাথাটা একদিকে সামান্য হেলিয়ে বলছে, 'জানি।'

বিমূঢ়ের মতো হিরণ্ময় বলছেন, 'জানো।'

'হ্যাঁ।' বিজলী চোখ সরু করে এবার বলেছে, 'সকালে তোমার বাবাকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। কিছুক্ষণ আগে তোমাদের কমলাদিও বেরুল। তাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম তোমার বাবা আর সে সন্ধের আগে ফিরছে না। তখন কী ভাবলাম জানো?'

বিজলীর সঙ্গ হিরণ্ময়ের কাছে জোরালো নেশার মতো। তার আকর্ষণ ঠেকিয়ে রাখার শক্তি তাঁর নেই। কিন্তু বিজলীকে নিজের ঘরে এনে বসাবার কথা কোনোদিন ভাবতে পারেন নি। হিরণ্ময়ের হৃৎপিন্ড অজানা আশঙ্কায় জমাট বেধে গিয়েছিল যেন। বুঝতে পারছিলেন না, পাড়ার লোকেরা বিজলীকে তাঁদের বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে কিনা। কোনোরকমে ঢোক গিলে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, 'কী ভেবেছিল?

'একা একা থাকতে নিশ্চয়ই তোমার খারাপ লাগবে। তাই ভাবলাম তোমার কাছে এসে মন ভাল করে দিয়ে আসি। একটু থেমে ঠোঁটের হাসিটাকে রহস্যময় করে বিজলী বলেছে, 'তা ছাড়া খুব একটা আর্জেন্ট কথাও আছে।'

চাপা গলায় হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেছেন, 'কী কথা?' বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছেন। এখান থেকে কোনাকুনি রাখাল আড্ডি রোডের একটা অংশ চোখে পড়ে, তবে রাস্তার দিক থেকে ঘরের ভেতরটা দেখা যায় না। হিরণ্ময়ের ভয়, বাবা আর কমলাদি না হয় সন্ধেবেলায় আসবে কিন্তু অন্য কেউ যদি হঠাৎ এসে পড়ে অরে বিজলীকে একই ঘরে তাঁর সঙ্গে দেখতে পায়— তখন? না, ভাবতে আর সাহস হয় নি হিরণ্ময়ের।

বিজলী এবার হালকা গলায় বলেছে, 'আর্জেন্ট ব্যাপারটা শুনেই তাড়িয়ে দিতে চাও নাকি?'

হিরণ্ময়কে নাকাল করে বোধ হয় মজা পেত বিজলী। তিনি ব্যস্তভাবে বলেছেন, 'না না, মানে—'

'আমি এসেছি বলে তোমার দুর্নামের ভয় তো?' বলে সারাসরি হিয়ণ্ময়ের চোখের দিকে তাকিয়েছে বিজলী।

মেয়েটা কি থটরিডার? মুখের দিকে তাকিয়ে মনের কথা পড়ে ফেলতে পারে? হিরন্ময় চমকে উঠেছেন, 'এই—ব্যাপারটা—' আসলে কী উত্তর দেবেন ভেবে পান নি।

বিজলী এবার বলেছে, 'আরে বাবা, তোমাদের বাড়িতে আমাকে কেউ ঢুকতে দেখে নি। যখন বেরুব চারদিক ভাল করে দেখে নেবো যাতে কারো নজরে না পড়ে যাই।' একটু থেমে রগড়ের গলায় আবার বলেছে, 'মাছ খাব, কিন্তু মুখে আঁশটে গন্ধটি থাকবে না। পাড়ার লোকের চিন্তাটা মাথা থেকে বার করে দাও তো।'

হিরন্ময় উত্তর দেন নি। বিজলী যতই ভরসা দিক, দুশ্চিন্তাটা তাঁর মাথায় থেকেই গিয়েছিল।

বিজলী অনবরত কথা বলে যাচ্ছিল, তার বেশির ভাগটাই কানে ঢোকে নি হিরন্ময়ের। নিজের অজান্তে বার বার তার চোখ চলে যাচ্ছিল জানালার বাইরে।

কতক্ষণ বাদে খেয়াল নেই, হঠাৎ হিরণ্ময়ের চোখে পড়েছে, বিজলী কখন যেন তাঁর খুব কাছে এসে বসেছে। এর আগে তাঁরা পাশাপাশি বসে সিনেমা দেখেছেন, ট্যাক্সিতে করে ঘুরেছেন, লেক বা গঙ্গার ধারে বেড়িয়েছেন কিন্তু সব সময়ই আশেপাশে লোকজন ছিল। এভাবে নির্জন ফাঁকা বাড়িতে একটি ঘরে আগে আর কখনও এত ঘন হয়ে বিজলী তাঁর গা ঘেঁসে বসে নি। কিসের যেন একটা সংকেত পেয়ে জমাট বাঁধা বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা প্রচণ্ড গতিতে লাফাতে শুরু করেছিল হিরন্ময়ের।

বিজলী তাঁর চোখের দিকে নীল চোখ দুটি স্থির করে এবার বলেছে, 'এক ঘণ্টা ধরে বক বক বক বক করে গেলাম, কিছুই তো শোন নি। এবার কিন্তু কাজের কথাটা শুনতে হবে।'

হিরণ্ময় চুপ।

বিজলী জিজ্ঞেস করেছে, 'আমরা কতদিন গড়ের মাঠে, গঙ্গার ধারে, লেকের পাড়ে ঘুরে আর সিনেমা দেখে বেড়াচ্ছি বল তো?'

হিরণ্ময় ঝাপসা গলায় বলছেন, 'আমি এম. এ'তে ভর্তি হবার পর থেকে।'

'তার মানে দু'বছর।'

'হ্যাঁ।'

বিজলী হিরণ্ময়ের চোখ থেকে চোখ সরায় নি। বলেছে, 'এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘোরাঘুরি করতে ভাল লাগছে না। তাড়াতাড়ি একটা কিছু ব্যবস্থা কর।'

বুঝতে না পেরে হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেছেন, 'কী ব্যবস্থা?'

'এক নম্বরের হাঁদারাম।' বলে দু হাতে হিরণ্ময়ের গলা জড়িয়ে তাঁকে চুমু খেয়েছিল বিজলী। সেটাই ছিল তার প্রথম চুম্বন।

সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল হিরণ্ময়ের। তাঁর মনে হচ্ছিল পাতলা একটা জিভ তাঁর মুখের ভেতর ঢুকে গেছে। ওটা যেন জিভ নয়, আগুনের হল্কা। তা ছাড়া এক জোড়া কোমল অথচ দৃঢ় মাংসল বুক তাঁর বুকে লেপটে যাচ্ছিল।

প্রথমটা সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেছে হিরণ্ময়ের। তারপর কখন যে রক্তের ভেতর দিয়ে তুফান ছুটতে শুরু করেছিল, কে জানে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত তেতে উঠে জ্বলন্ত মশাল হয়ে গিয়েছিল যেন। জাগতিক নিয়মেই এবং একসময় নিজের অজান্তেই বুঝিবা দু হাত তুলে বিজলীকে সমস্ত শক্তিতে জড়িয়ে নিয়েছিলেন হিরণ্ময়।

তারপর দু'টি শরীর প্রবল উত্তাপে গলে গলে পরস্পরের মধ্যে মিশে গিয়েছিল যেন। আবার সে দুটো আবার ধীরে ধীরে কতক্ষণ বাদে আলাদা হয়ে গিয়েছিল আজ আর মনে পড়ে না। সমস্ত ব্যাপারটা যেন কোনো অলীক স্বপ্নের ঘোরে ঘটে গেছে।

হিরণ্ময় লক্ষ করেছিলেন তাঁর বুকের ভেতর নিবিড় হয়ে শুয়ে আছে বিজলী। তার মুখে এমন একটি হাসি যা মেয়েরা জীবনে একবারই হাসতে পারে—লাজুক, ভঙ্গুর, প্রগাঢ় সুখে আচ্ছন্ন। তখন বিজলীকে দেখে মনে হয় নি যে সে অত্যন্ত বেপরোয়া এবং লজ্জাহীন।

একসময় আস্তে আস্তে উঠে আলুথালু শাড়ি গুছিয়ে নিয়ে এলোমেলো চুল ঠিকঠাক করে বিজলী বলেছে, 'সব দিয়ে তোমাকে নিজের করে নিলাম। যত তাড়াতাড়ি পারো আমাকে তোমার কাছে নিয়ে আসবে। এখন যাচ্ছি।' হিরণ্ময়ের ঠোঁটে আলতো

করে ঠোঁট ছুঁইয়ে চলে গিয়েছিল সে।

আর হিরণ্ময়ের মনে হয়েছিল, বিজলীকে ছাড়া তাঁর চলবে না। আচ্ছন্নের মতো অনেকক্ষণ বসে ছিলেন তিনি।

বিজলী যেদিন আসে তার দিন চারেক বাদে একদিন রাত্তিরে হঠাৎ তাঁর ঘরে এসেছিলেন বাবা। তখন প্রায় এগারোটা বাজে। হিরণ্ময় শুতে যাচ্ছিলেন, বাবাকে দেখে অবাক হয়ে যান। তাঁর বিস্ময়ের যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রথমত, বাবা ক্বচিৎ তাঁর ঘরে আসতেন। তার ওপর অত রাতে এর আগে কখনও এসেছেন কিনা তাঁর মনে পড়ে না।

হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেছেন, 'তুমি কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নেড়েছিলেন বাবা।

এবার আর কিছু না বলে উৎসুক চোখে তাকিয়েছেন হিরণ্ময়। বাবার হঠাৎ এভাবে আসার জন্য ভেতরে ভেতরে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

কিভাবে শুরু করবেন, বাবা ভেবে উঠতে পারছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন হিরণ্ময়ের জন্য তাঁর খুব গর্ব ছিল। নিজে তিনি অতি সাধারণ কেরানী। অসাধারণ মেধাবী ছেলে এবং তাঁর মধ্যে কোথায় যেন একটা দূরত্ব ছিল।

বেশ কিছুক্ষণ পর দ্বিধান্বিতভাবে বাবা বলেছেন, 'পাড়ার লোকে খুব দুর্নাম করছে।'

হিরণ্ময় চকিত হয়ে উঠেছেন, 'কার? আমার?'

'হ্যাঁ।' চোখ নামিয়ে মলিন মুখে আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছিলেন বাবা। হিরন্ময়ের দুর্নাম যেন তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষতি, এমনই দিশেহারা দেখাচ্ছিল তাঁকে।

হিরণ্ময় বিভ্রান্তের মতো জিজ্ঞেস করেছেন, 'কেন, আমি কী করেছি?'

'আমি যেদিন ব্যারাকপুর যাই আর কমলা টালিগঞ্জে, সেদিন দুপুরে কি ব্রজরাখাল মাস্টারের মেয়ে বিজলী তোমার কাছে এসেছিল?'

হিরণ্ময়ের পায়ের তলায় শক্ত সিমেণ্টের মেঝে যেন ঢেউয়ের মতো দুলে উঠেছিল, মাথার ভেতর আগুনের চাকার মতো কিছু

একটা প্রবল আওয়াজ করে ঘুরতে শুরু করেছিল। মনে হচ্ছিল তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না। ঘাড় ভেঙে মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল হিরন্ময়ের। যতই চারিদিক দেখেশুনে লুকিয়ে চুরিয়ে বিজলী তাঁদের বাড়িতে আসুক না, পাড়ার লোকেদের চোখে ধুলো দিতে পারে নি। তারা তাকে ঠিক দেখে ফেলেছে এবং যথাসময়ে বাবার কানে খবরটি তুলে দিয়েছে।

বাবা বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করিনি। যারা আমাকে ব্রজরাখালের মেয়ের কথা বলেছিল আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তারা মিথ্যে বলে নি।' বলতে বলতে গলা ধরে গিয়েছিল তাঁর, চোখদুটো ক্রমশ জলে ভরে যাচ্ছিল।

হিরন্ময় উত্তর দেন নি। উত্তর দেবার মতো কিছুই ছিল না তাঁর।

বাবা এবার বলেছেন, 'তোমার কাছে এ আমি আশা করিনি। এতদিন তুমি আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করে আসছিলে। তোমাকে নিয়ে আমার কত গর্ব। লোকে যখন প্রশংসা করত আমার বুক ভরে যেত। কিন্তু এটা তুমি কী করে বসলে বাবা! আমি যে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারছি না।'

হিরণ্ময় এবারও চুপ। বাবার প্রতিটি ধিক্কার তাঁর বুকের ভেতর জ্বলন্ত লোহার ফলার মতো বিঁধে যাচ্ছিল। এই অতি নিরীহ অতি শান্ত মানুষটি যে কত দুঃখ পেয়েছেন বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না।

বাবা সেদিন আর কিছু বলেন নি, সর্বস্বান্ত ভাঙচোরা মানুষের মতো এলোমেলো পা ফেলে প্রায় টলতে টলতে চলে গিয়েছিলেন।

দিন দুই পর সেই রাত এগারটা নাগাদ বাবা ফের তাঁর ঘরে এসেছিলেন। বলছেন, তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। কোনোদিন তোমাকে কিছু বলিনি, স্বাধীনভাবে চলতে দিয়েছি। তুমি যখন যা বলেছ যা করেছ, সব মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার এই অনুরোধটা তোমাকে রাখতে হবে। জীবনে দ্বিতীয় বার তোমাকে আর কোনো অনুরোধ করব না।'

হিরণ্ময় ব্যাকুল ভাবে বলেছেন, 'ওভাবে বলছ কেন বাবা। তুমি যা বলবে তাই করব।'

'কথা দিলে কিন্তু।'

হিরণ্ময়ের বিশ্বাস ছিল বাবা এমন অসঙ্গত কিছু বলবেন না যা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'বেশ ভেবে বল।'

'বললাম তো।'

বাবা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, 'আমি একটি মেয়ে দেখেছি। সদ্বংশ, দেখতেও সুন্দর। এ বছর লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজ থেকে ইংরেজিতে ফাস্ট ক্লাশ পেয়ে বি. এ পাশ করেছে। ভবানীপুরে ওদের তেতলা বাড়ি। ছোট ফ্যামিলি, মা বাবা আর দুই ভাইবোন ছাড়া কেউ নেই। ভাইটাও লেখাপড়ায় ভাল, এ বছর আই আই টি খড়্গপুরে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি হয়েছে। বাবা একটা বিদেশি কোম্পানির একজিকিউটিভ, মা স্কুলে অ্যাসিস্টাণ্ট মিসট্রেস। আশা করি এমন ফ্যামিলির মেয়ে তোমার অযোগ্য হবে না।' গড় গড় করে একটানা মুখস্থ বলার মতো কথাগুলো বলে একটু থেমেছেন বাবা। তারপর আস্তে আস্তে ফের বলেছেন, 'মেয়ের মা-বাবার আর সেই সঙ্গে আমারও একান্ত ইচ্ছে, বিয়েটা আসছে মাসের মধ্যে হোক।'

চমকে উঠেছিলেন হিরণ্ময়। বাবা যে তাঁর বিয়ের ব্যাপারে এতদূর এগিয়ে গেছেন ভাবতে পারেন নি তিনি। বুঝতে পারছিলেন, তাঁর জীবন থেকে বিজলীকে সরিয়ে দেবার জন্য এটা বাবার একটা কৌশল। যদিও নতুন কিছু নয়। চিরকালই মা বাবারা উচ্ছৃঙ্খল অসংযত ছেলেদের এভাবে সৎ পথে ফেরাবার চেষ্টা করে এসেছে।

বিজলী সেদিন দুপুরে যদি না আসত, হিরণ্ময় বাবার কথায় হয়তো রাজী হয়ে যেতেন। কিন্তু তাঁর সর্বাঙ্গে তখনও বিজলীর শরীরের উত্তাপ আর মাদকতা মিশে আছে। মুখ নামিয়ে হিরণ্ময় বলেছিলেন, 'তুমি আর যা বল সব করব কিন্তু এই বিয়েটা করতে বলো না বাবা।'

স্থির চোখে হিরণ্ময়কে দেখতে দেখতে বাবা বলেছিলেন, 'শুধু

এই অনুরোধটা ছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই। সেটা রাখা না-রাখা তোমার ইচ্ছে।'

হিরণ্ময় উত্তর দেন নি।

বাবা এবার জিজ্ঞেস করেছেন, 'তুমি কি বিয়েই করতে চাও না ?'

হিরণ্ময় মুখ না তুলে বলেছিলেন, 'না তা নয়।'

'তা হলে ?'

হিরণ্ময় চুপ করে থেকেছেন।

বাবা আচমকা জিজ্ঞেস করেছেন, 'তবে কি ধরে নেবো, তুমি ব্রজরাখাল মাস্টারকে বিয়ে করতে চাইছ ?'

হিরণ্ময় হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, মানে—'

'কিন্তু এ ভুলটা তুমি ক'বো না বাবা। মেয়েটার ভীষণ বদনাম।' বাবার চোখেমুখে ব্যাকুলতা ফুটে বেরিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'তোমার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে '

হিরণ্ময় বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু পরক্ষণে তাঁর মনে হয়েছে একটি মেয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক ঘটে যাবার পর তাকে বিয়ে না করাটা অন্যায়। বিজলীর ব্যাপারে নৈতিক দায়িত্ব তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন না। বিষন্ন মুখে হিরণ্ময় বলেছেন, 'আমার উপায় নেই বাবা।'

বাবা আর একটি কথাও বলেন নি। সর্বস্ব খোয়ানোর পর যেমন হয় সেইভাবে একবার ছেলের দিকে তাকিয়ে প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

পরের মাসেই বিজলীর সঙ্গে বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল। এই নিয়ে রাখাল আড্ডি রোড বেশ কয়েকটা দিন একেবারে তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল। ওখানকার বাসিন্দাদের আক্ষেপ, হিরণ্ময়ের মতো অমন হীরের টুকরো ছেলে কিনা ওইরকম একটা বজ্জাত বাজে মেয়েকে বিয়ে করার জন্য খেপে উঠল! যারা পুরনোপন্থী তারা বললে, বিজলী নিশ্চয়ই তুকতাক কিছু করেছে। এ জাতীয় মেয়েরা সব পারে। কেউ বললে, নিয়তিকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। যা ভবিতব্য তা কে খণ্ডাতে পারে?

বিয়ের পর বাবা একেবারে নির্লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আগে

অফিসের সময়টুকু ছাড়া বাড়ি থেকে প্রায় বেরুতেনই না। এখন সকাল হলেই বেরিয়ে যেতেন, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বা পার্কে সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরেই স্নানটান করে, খেয়ে অফিসে চলে যেতেন। ফিরতেন বেশ রাত করে। শুধু খাওয়া আর শোওয়া ছাড়া বাড়ির সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক ছিল না তাঁর। ছুটির দিনের রুটিনটা ছিল অন্য রকম। আগে বাড়িতে তাসের আসর বসত। হিরণ্ময়ের বিয়ের পর সে আসর ভেঙে দিয়েছিলেন বাবা, তিনি নিজেই রবিবার বা অন্য ছুটির দিন সকালে বন্ধুবান্ধবের বাড়ি চলে যেতেন। সেখানে সারাদিন কাটিয়ে মাঝরাতে ফিরতেন। পারতপক্ষে তাঁর বা বিজলীর সঙ্গে কথা বলতেন না।

বিজলীকে বিয়ে করায় বাবা যে খুব দুঃখ পেয়েছেন সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় নি হিরণ্ময়ের। বাবার জন্য তাঁর প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছে কিন্তু কিছু করার ছিল না।

বাবার ব্যাপারটা বাদ দিলে বিজলীকে নিয়ে সময় অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে কেটে যাচ্ছিল।

বিয়ের মাস দুয়েক বাদে এম. এ'র রেজাল্ট বেরুলে দেখা গেল হিরণ্ময় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন। বিজলী দারুণ খুশি হয়ে বলেছেন, 'ব্যস, পড়াশোনা শেষ হল। এবার খুব বড় একটা চাকরি নাও। অনেক টাকা মাইনে হওয়া চাই। আমার সেই কথাটা মনে আছে তো?'

হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেছেন, 'কোন কথা?'

'কী আশ্চর্য, তোমার মনে নেই!'

'না, ঠিক—'

বিজলী বলেছে, 'কাজের কথা মনে থাকবে কেন? সেই যে একদিন বলেছিলাম তুমি বিরাট চাকরি করবে, আমাদের দারুণ সুন্দর একটা বাড়ি হবে, বড় একটা গাড়ি কিনবে। আর—'

মনে পড়ে গিয়েছিল হিরণ্ময়ের। হাত তুলে বিজলীকে থামিয়ে দিতে বলেছেন, 'কিন্তু তা তো এখন সম্ভব নয়।'

বিজলী ভুরু কুঁচকে জানতে চেয়েছে, 'কেন?'

হিরণ্ময় জানিয়েছেন, ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ইচ্ছা বড় হয়ে কলেজে পড়াবেন। এম. এ'তে তাঁর যা রেজাল্ট তাতে যে কোনো

কলেজ তাঁকে লুফে নেবে। এর মধ্যে তিন চারটে কলেজ থেকে পড়ানোর জন্য অফারও দেওয়া হয়েছে। এর থেকে একটা বেছে নিয়ে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রিসার্চও করবেন।

বিজলী খুশি হয় নি। নিরুচ্ছ্বাস সুরে জিজ্ঞেস করেছে, 'কত মাইনে দেবে?'

হিরণ্ময় হেসে বলেছেন, 'কত আর দেবে। খুব বেশি হলে চারশ সাড়ে চার শ।' সে আমলে নতুন একজন লেকচারারকে শুরুতে এরকমই দেওয়া হত।

বেজলী ঠোঁট বাঁকিয়ে বলেছে, 'মোটে! না না, আমাদের অনেক টাকা চাই। তুমি বড় কোম্পানিতে চাকরি নাও।'

'অসম্ভব। কলেজে পড়ানোটা আমার স্বপ্ন। খুব বেশি টাকার দরকার কী। ভদ্রভাবে দিন চলে গেলেই হল।'

কিন্তু বিজলীর জীবন দর্শন একেবারেই অন্যরকম। তার দাবি অঢেল টাকা, অঢেল আরাম, অজস্র সুখ।

স্ত্রী অসন্তুষ্ট হবে জেনেও হিরণ্ময় বিচলিত হন নি। তিনি কলেজেই চাকরি নিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে রিসার্চও শুরু করেছিলেন।

সম্পর্কে তখন থেকেই চিড় ধরেছিল। ক্রমশ হিরণ্ময় বুঝতে পারছিলেন বিজলী তাঁকে ইচ্ছা পূরণের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। তাঁর রেজাল্ট দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল বিজলীর। সে হয়তো ভেবেছিল, এম. এ-র রেজাল্ট বেরুবার পর তার কথা-মতো টাকার পেছনে দৌড়তে থাকবেন হিরণ্ময়। স্বপ্নভঙ্গ হওয়ায় তার মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

বিজলী খুব এক্সট্রোভার্ট ধরনের মেয়ে। তার মন সবসময় থাকত বাইরের দিকে। সিনেমা দেখা, গাড়িতে বেড়ানো, দামী রেস্তোরাঁয় খাওয়া—এসব তার ভীষণ পছন্দ। কিন্তু তাকে নিয়ে বেরুবার সময় কোথায় হিরণ্ময়ের। কলেজ, ছাত্রছাত্রী আর রিসার্চ নিয়ে তখন তিনি মগ্ন হয়ে আছেন।

এইভাবে বছর তিনেক কেটে গিয়েছিল। একই বাড়িতে তিনটে মানুষ তখন আলাদা আলাদা তিনটে দ্বীপ। মাঝে মাঝে কোনো নির্জন মুহূর্তে হিরণ্ময়ের মনে হত, বাবার কথাটা না মেনে

মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু তখন আর কিছু করার উপায় ছিল না।

যাই হোক, এই তিন বছরে বড় বড় যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল তা এইরকম। হিরণ্ময়ের গবেষণা শেষ হয়েছে, তিনি ডক্টরেট পেয়েছেন। তাঁর রিসার্চওয়ার্ক বই হয়ে বেরিয়ে দারুণ হই-চই ফেলে দিয়েছিল। নানা অর্থনৈতিক ম্যাগাজিন আর দৈনিক পত্রিকা তাঁর কাছে লেখা চাইছিল। তিনিও অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বাংলা আর ইংরেজিতে প্রচুর লিখতে শুরু করেছিলেন। শুধু কলকাতার কাগজগুলোতেই না, দিল্লী বোম্ব্যই মাদ্রাজের পেপারগুলোও তাঁর লেখার জন্য নিয়মিত তাগাদা দিচ্ছিল। লেখালেখির কারণে সারা ভারতে তাঁর নাম দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছিল।

মনে পড়ে, এর ভেতর জৈব নিয়মেই তাঁর আর বিজলীর একটি মেয়ে হয়েছে। তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল মল্লি।

সন্তানের জন্ম এবং বিবাহিত জীবনও বিজলীর বহির্মুখী মনকে ঘরের দিকে ফেরাতে পারে নি। সংসারে পোষ মানার মতো মেয়ে সে নয়।

অনেক রঙিন আশা আর স্বপ্ন নিয়ে একরকম ফাঁদে ফেলেই হিরণ্ময়কে বিয়েটা করেছিল বিজলী। স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ায় ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে উঠতে থাকে সে। হুটহাট বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত। যখন ইচ্ছা ফিরত।

স্ত্রীর মন সংসারের দিকে ফেরাবার জন্য তাঁর নিজের মতো করে কম চেষ্টা করেন নি হিরণ্ময়। বোঝাতেন সে বিবাহিত, সন্তানের মা, তার এ ধরনের আচরণ খুবই অন্যায়। কিন্তু এসব কথা বিজলীর এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যেত।

মনে পড়ে, এ রকম অশান্তি যখন চলছে সেই সময় তাঁদের পাড়ায় মনোহর রক্ষিতরা এল। ঠিক পাড়ার ভেতরে নয়, রাখাল আড্ডি রোডটা যেখানে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েছে তার ডান পাশের দু'খানা বাড়ি ছেড়ে তার পরের পুরনো তেতলা বাড়িটা লিজ নিয়েছিল সে।

মনোহর হিরণ্ময়েরই প্রায় সমবয়সী, দু-এক বছর এদিক ওদিক

হতে পারে। গায়ের রং তামাটে, জোড়া ভুরু। বেশ লম্বা চওড়া পুরুষালি চেহারা। পরনে সারাক্ষণ ফিনফিনে ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি। তার আংটি, বোতাম—সব হীরে-বসানো।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। কার কাছে যেন হিরণ্ময় শুনেছিলেন, মনোহর রক্ষিত যুদ্ধের বাজারে কনট্রাক্টরি করে প্রচুর টাকা করেছে। লোকটা যে অগাধ পয়সাওলা সেটা মাসখানেকের ভেতর টের পাওয়া গিয়েছিল। লিজ নেওয়া পুরনো বাড়িটা সারিয়ে সুরিয়ে ভোল পাল্টে ফেলেছিল সে। বাড়ির কমপাউণ্ডের ভেতর তিনখানা দামী মোটরও দেখা যেত।

যুদ্ধের পর মনোহর কনট্রাক্টরি ছেড়ে দেয় নি, পুরোদমে সেটা চালিয়ে যাচ্ছিল।

মনোহরের বাড়িতে সে এবং তার মা ছাড়া আর কেউ থাকত না। সে বিবাহিত কিনা তখনও জানা যায় নি। তবে মা-ছেলে ছাড়া অনেকগুলো কাজের লোক ছিল—ড্রাইভার, মালী, রান্নার ঠাকুর, ইত্যাদি।

এমনিতে নিজের পড়াশোনা, লেখালেখি এবং কলেজে পড়ানো ছাড়া অন্য কোনো দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকত না হিরণ্ময়ের। তবু টের পাচ্ছিলেন, মনোহর আসার পর সমস্ত এলাকাটায় বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। লোকের মুখে মুখে তার নাম, এমন দিলদরিয়া মানুষ নাকি হয় না। পাড়ার তিনটে ক্লাব আর একটা লাইব্রেরিকে নাকি মোটা টাকা ডোনেসন দিয়েছে। টাকার জন্য মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, ছেলের পড়া বন্ধ হয়ে যাবে—এ জাতীয় সমস্যা নিয়ে কেউ গেলে তার কাছ থেকে খালি হাতে ফেরে না। চারিদিকে মনোহর সম্বন্ধে তখন প্রচুর সুখ্যাতি।

· কিন্তু মাস তিন চারেক বাদে অন্যরকম শোনা যেতে লাগল। দেদার টাকা খরচ করলেও মনোহর লোকটা নাকি ভাল নয়। নেশাখোর, মাতাল, মেয়েমানুষের দোষ আছে। এ পাড়ায় আসার আগে দু'বার বিয়ে করেছিল। দুই স্ত্রীই নাকি দুশ্চরিত্র স্বামীকে ছেড়ে চলে গেছে।

অন্যের চরিত্র নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো যথেষ্ট সময় বা রুচি কোনোটাই ছিল না হিরণ্ময়ের। তিনি নিজের কাজের

মধ্যেই ডুবে ছিলেন। একটু আধটু যা কানে আসত তৎক্ষণাৎ ভুলে যেতেন।

কিন্তু বেশিদিন চোখ কান বুজে নিজের কাজকর্ম নিয়ে থাকা গেল না। আঁচ তাঁর গায়েও এসে লাগল।

কানাঘুষোটা বেশ কিছুকাল ধরেই চলছিল, হিরণ্ময় টের পান নি। একদিন সন্ধেবেলা কলেজ থেকে ফিরছেন, রাখাল আড্ডি রোডের এক পুরনো বাসিন্দা ভবনাথ—ভবনাথ মজুমদার রাস্তায় তাঁকে ধরলেন। খুবই নিরীহ, নির্বিরোধ মানুষ, কারুর সাতে-পাঁচে থাকেন না। নিচু গলায় বলেছিলেন, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে বাবা।'

ছেলেবেলা থেকেই ভবতোষকে দেখে আসছেন হিরণ্ময়। তাঁর সঙ্গে সাকুল্যে ক'টি কথা হয়েছে, আদৌ হয়েছে কিনা, মনে পড়ে না। বেশ অবাক হয়েই হিরণ্ময় বলেছেন, 'কী কথা?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভবতোষ বলেছেন, 'তোমার কানে কি কিছুই যায় নি?

'কী ব্যাপারে?'

'তোমার স্ত্রী বিজলীর ব্যাপারে'

বিয়ের পর তখন পর্যন্ত বিজলী সম্পর্কে সত্যিই খারাপ কিছু শোনেন নি হিরণ্ময়। তিনি বলেছিলেন, 'না তো।'

ভবনাথ বলেছিলেন, 'তোমাকে দুঃখ দিতে চাই না, তবু না জানালে ভীষণ অন্যায় হবে। তুমি আমার ছেলের মতো, তোমাকে নিয়ে আমাদের কত গৌরব। তোমার ক্ষতি হোক, এটা আমি চাই না।' একটু থেমে আবার শুরু করেছিলেন, 'বিজলী ওই বদমাশ কনট্রাক্টরটার সঙ্গে বড্ড বেশি মেশামেশি করছে। ব্যাপারটা খুব দৃষ্টিকটু।'

ভবনাথের সঙ্গে কোনোদিন বেশি কথাবার্তা না হলেও তাঁর সম্বন্ধে সবই জানতেন হিরণ্ময়। তিনি শুধু নিরীহই নন, অত্যন্ত সৎ এবং ধর্মভীরু মানুষ। তাঁর চোখে যখন মনোহর আর বিজলীর মেলামেশা খারাপ ঠেকেছে তখন সেটা খারাপই। হিরণ্ময় চমকে উঠেছেন।

ভবনাথ থামেন নি, 'বিজলীকে তো আমরা ছেলেবেলা থেকেই

জানি। স্বভাবটা কোনোকালেই ভাল না। তবু যখন তুমি বিয়ে করলে ভাবলাম নিজেকে ও শুধরে নেবে। সে যাক, পাড়ার লোকেরা সব জেনে ফেলেছে। বড় রকমের কেলেঙ্কারি হওয়ার আগে ওকে সামলাও।'

শুধু ভবনাথই নন, এরপর রাখাল আড্ডি রোডের আরো কয়েকজন বয়স্ক মানুষ তাঁকে একই কথা বলেছিলেন। এমন কি যে বাবা সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন, একদিন তিনিও বলেছেন, 'কী কালসাপ ঘরে এনে তুলেছ, এবার ভেবে দেখ। বংশের মুখে চুনকালি দেওয়া যেটুকু বাকি আছে সেটা শেষ করে ফেলুক।' এমন রূঢ়ভাবে আগে আর কখনও বলেননি বাবা।

একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন হিরণ্ময়। কী করবেন, স্ত্রীকে কী বলবেন, ভেবে উঠতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত একদিন মরিয়া হয়েই জিজ্ঞেস করেছেন, 'তোমার নামে এসব কী শুনছি ?'

বিজলী যেন জানতই কোনো এক সময় এরকম একটা প্রশ্নের জবাবদিহি তাকে করতে হবে। সে হেসে হেসে বলেছে, 'ও, মনোহরবাবুর সম্বন্ধে জানতে চাইছ তো ?'

উত্তর না দিয়ে পলকহীন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থেকেছেন হিরণ্ময়।

বিজলী এবার জিজ্ঞেস করেছে, 'কে কথাটা তোমার কানে তুলল ? পাড়ার লোকেরা ?'

এবারও চুপ করে থেকেছেন হিরণ্ময়।

বিজলী বলেছে, 'এ পাড়ার লোকগুলো ভীষণ কুচুটে। কাছাকাছি মনোহরবাবুদের বাড়ি। যদি যাই-ই, ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু হেসে যদি কথা বলিই, মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় ?'

খুব শান্ত মানুষ হিরণ্ময় কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁর মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন, 'অন্যের বেলায় হয় না, তবে তোমার বেলায় হয়। তুমি বাড়ি থেকে আর বেরুবে না।'

কিন্তু বিজলীকে আটকানো যায় নি। খবর পাচ্ছিলেন, তিনি কলেজে চলে যাবার পর সে দুপুরে বেরিয়ে পড়ত। ছুটির পর

তিনি বাড়ি আসার আগে ফিরে আসত।

বিজলী আর মনোহরকে নিয়ে রাখাল আড্ডি রোড ক্রমশ যে সরগরম হয়ে উঠছে, সেটা দ্রুত বুঝতে পারছিলেন হিরণ্ময়। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর বেরুনো ঠেকাবার জন্য মাসখানেক ছুটি নিয়েছিলেন। এই নিয়ে বিজলীর সঙ্গে অশান্তি চরমে উঠেছিল কিন্তু কিছুতেই তাকে বাড়ির বাইরে পা ফেলতে দেন নি।

মনে পড়ে, ছুটি যখন ফুরিয়ে আসছে সেই সময় হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলায় আংটি আর বোতামে হীরের ঝিলিক দিয়ে, দামী সেন্টের গন্ধ ছড়িয়ে বিরাট মোটরে করে মনোহর তাঁদের বাড়ি এসে হাজির। অমায়িক হেসে হিরণ্ময়কে বলেছিল, 'আপনার মতো পণ্ডিত মানুষ দেশের গর্ব, একটু আলাপ করতে এলাম।'

লোকটার দুঃসাহসে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন হিরণ্ময়। মনোহর যে বিজলীকে ক'দিন না দেখতে পেয়ে তাঁদের বাড়িতে হানা দেবে, এতটা ভাবতে পারেন নি তিনি। হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'গেট আউট স্কাউন্ড্রেল, গেট আউট।'

লোকটার আশ্চর্য সহনশীলতা। গায়ের চামড়াও হয়তো বেজায় পুরু, অপমান বোধটোধ নেই বললেই হয়। বেরিয়ে যাবার কথা বললেও মনোহর উত্তেজিত হয়নি। মুখের হাসিটি অটুট রেখে বলেছে, 'গালাগাল দিচ্ছেন!'

গলার স্বর আরো কয়েক পর্দা চড়িয়ে দিয়েছেন হিরণ্ময়, 'রাসকেল, গাটার স্নাইপ—'

মনোহরের মতো এমন নির্লজ্জ দু-কানকাটা লোক ক্বচিৎ চোখে পড়ে। অপমানবোধ তার নেই বললেই হয়। আগের মতোই হেসে হেসে সে বলেছে, 'বুঝতেই পারছি নোংরা লোকেরা আমার সম্বন্ধে উল্টোপাল্টা খবর দিয়ে আপনার কান ভারী করেছে। নিন্দুকেরা যে যাই বলুক, বিজলীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা শুধু বন্ধুত্বের। বিশ্বাস করুন, ফ্রেন্ডশিপ ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কিছু নেই।'

মাথার ভেতর রক্তবাহী শিরাগুলো ছিঁড়ে গিয়েছিল যেন। উন্মত্তের মতো চিৎকার করে তুলেছিলেন হিরণ্ময়, 'জুতিয়ে তোমার গাল ছিঁড়ে দেবো। বন্ধুত্ব! ফ্রেন্ডশিপ!'

চেঁচামেচি শুনে পাড়ার লোকজন দৌড়ে এসেছিল আর এসেছিল ক্লাবের ছেলেরা। রাখাল আড্ডি রোডের বাসিন্দারা হিরণ্ময়কে কোনোদিন এত উত্তেজিত হতে দেখেনি।

এতকাল বাদেও হিরণ্ময়ের মনে পড়ে, সেদিন তাঁর মাথার ঠিক ছিল না। সবার উদ্দেশে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছেন, 'এই শুয়োরের বাচ্চাটার স্পর্ধা দেখুন। আমার ফ্যামিলি লাইফ ডিসটার্ব করে আবার আমাদের বাড়িতেই হাজির হয়েছে। আই উইল কিল হিম।'

হিরণ্ময়ের মতো শান্ত সংযত ভদ্র মানুষের এত রাগ আর উত্তেজনা এ পাড়ার লোকজনের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দিয়েছিল যেন। বিশেষ করে ক্লাবের ছেলেরা মনোহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, বয়স্ক কয়েকজন তাদের ঠেকিয়ে না রাখলে মারাত্মক কাণ্ড ঘটে যেত।

তখন দিনকাল অন্যরকম ছিল। ক্লাবে টাকা ঢাললেই ছেলেদের কিনে ফেলা যেত না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জোর তাদের ছিল। তা ছাড়া ওরা হিরণ্ময়কে খুবই শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। রাখাল আড্ডি রোডের প্রতিটি যুবকের মনে আঁকা ছিল তাঁর অতি উজ্জ্বল একটি ইমেজ। কারুর পক্ষে হিরণ্ময়ের ক্ষতি করে পার পেয়ে যাবার উপায় ছিল না। এতদিন তিনি ডাকেন নি বলে কেউ এগিয়ে আসে নি। এবার সুযোগটা তারা পেয়ে গিয়েছিল।

'তরুণ দল' ক্লাবের সেক্রেটারি অনুপম মনোহরের গলার কাছটা খামচে ধরে গর্জে উঠেছিল, 'জানোয়ারের বাচ্চা, দশ দিন সময় দিলাম। তার ভেতর এই এরিয়া ছেড়ে না গেলে তোমার ছাল খুলে নেবো।'

আরেকটি ছেলে দাঁতে দাঁত চেপে বলেছে, 'শালা হারামী, কোথায় তুমি হাত দিয়েছ জানো। হিরণ্ময়দাকে আমরা ভগবানের মতো ভক্তি করি।' বলে মনোহরকে ধাক্কা মারতে মারতে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল।

তারপর পাঁচটা দিনও কাটেনি, মনোহর চেতলা ছেড়ে সত্যি সত্যিই চলে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে মল্লিকে নিয়ে উধাও হয়েছিল বিজলী।

প্রথমটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো স্ত্রী এবং মেয়েকে খোঁজাখুঁজি করেছেন হিরণ্ময়। থানায় গেছেন, ব্রজরাখালের কাছে গেছেন, লালবাজারে গেছেন কিন্তু কোথাও তাদের পাওয়া যায় নি। বিজলী নষ্ট দুশ্চরিত্র মেয়েমানুষ, তবু তাকে ভালবেসেছিলেন, সেটা নতুন করে সেই সময় টের পেয়েছিলেন। বিজলীদের না পেয়ে একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন হিরণ্ময়।

এদিকে এমন একটা ঘটনায় রাখাল আড্ডি রোডের নিস্তরঙ্গ জীবনে তুমুল হইচই শুরু হয়ে গিয়েছিল। সবাই বিজলী সম্বন্ধে যা মুখে এসেছে তাই বলেছে। বিজলীর নিন্দায় কান পাতা যাচ্ছিল না। সকলেরই আক্ষেপ, এমন একটা নোংরা বাজে মেয়ে হিরণ্ময়ের মতো মানুষের জীবন একেবারে ছারখার করে দিল। কেউ কেউ বাড়িতে এসে তাঁকে সহানুভূতিও জানিয়ে গেছে। শুভাকাঙ্ক্ষীরা বলেছে, এ একরকম ভালই হল। কালসাপ বিদায় হয়েছে, এবার হিরণ্ময় নতুন করে জীবন শুরু করুন। ভ্রষ্ট, বিশ্বাসঘাতক স্ত্রী নিয়ে ঘর করা যে কতখানি বিপজ্জনক সেটা তারা নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

অবশ্য অন্যরকম কিছু কিছু কথাও কানে এসেছে হিরণ্ময়ের। তিনি ব্যক্তিত্বহীন, তাঁর মেরুদণ্ডের জোর নেই, নইলে স্ত্রী কখনও হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যেতে পারে? পারে কি ওভাবে মুখে চুনকালি দিয়ে পালিয়ে যেতে? তিনি কি পুরুষ।

সহানুভূতি, নিন্দা, ধিক্কার বা খোঁচা-দেওয়া মন্তব্য—এ সব শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, মাথা খারাপ হয়ে যাবে। রাস্তায় বেরুনোই ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল, একটা আলো-বাতাসহীন সুড়ঙ্গের ভেতর কারা যেন এলোপাথাড়ি ধাক্কা মারতে মারতে তাঁকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। হিরণ্ময়ের দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

বাবাও একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। আগে খাওয়া এবং শোওয়াটুকু ছাড়া বাড়ির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। বিজলী পালিয়ে যাওয়ার পর বাড়ি থেকে বেশ কিছুদিন বেরুতেন না। লোকের সহানুভূতি বা ধিক্কারে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন।

এই সময় একটা বড় রকমের ব্যাপার ঘটল আর সেটাই

হিরণ্ময়দের বাঁচিয়ে দেয়। কলকাতায় একটা বড় সলিসিটর ফার্ম বাবাকে চিঠি দিয়ে জানায় তাঁর এক নিঃসন্তান পিসিমা ওল্ড বালিগঞ্জেব একখানা বাড়ি তাঁর নামে উইল করে গেছেন।

বাড়িটা হাতে আসার পর সাতটা দিনও দেরি করেন নি হিরণ্ময়রা, মালপত্র লরিতে চাপিয়ে ওল্ড বালিগঞ্জে চলে এসেছিলেন। তারপর একমাসের মধ্যে রাখাল আড্ডি রোডের বাড়িটা একরকম জলের দরে বেচে দিয়েছেন বাবা।

বিজলীদের পালিয়ে যাবার ব্যাপারটা শুধু চেতলার মানুষজনই জানত না। ক্রমশ সেটা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। খারাপ খবর, বিশেষ করে স্ক্যাণ্ডাল চাপা থাকে না, সেগুলো হাওয়ায় উড়তে থাকে। কলকাতায় তো তাঁদের আত্মীয়স্বজন এবং চেনাজানা মানুষ কম নেই। খবরটা তাদের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিল।

সবচেয়ে অসুবিধে হচ্ছিল কলেজে। ছাত্রছাত্রী এবং সহকর্মীরা সোজাসুজি তাঁকে কিছু বলতেন না। নিজেদের মধ্যে গুজগুজ করতেন, ছেলেমেয়েরাও তাই। সবাই এমনভাবে চোখের কোণ দিয়ে তাকাত যে ভীষণ অস্বস্তি হতে থাকত।

কলকাতা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। হিরণ্ময় মরিয়া হয়ে বাংলার বাইরে নানা কলেজ এবং উইনিভার্সিটিতে চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত দিল্লি ইউনিভার্সিটির চাকরিটা তাঁর হয়ে যায়।

বাবাকেও দিল্লিতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন হিরণ্ময়, তিনি যান নি। বলেছেন, তাঁর সবসময় রাস্তায় না বেরুলেও চলে, ওল্ড বালিগঞ্জ অঞ্চলে তাঁদের জানাশোনা কেউ থাকে না। কাজেই অস্বস্তির কারণ নেই। বাড়ি বয়ে কেউ অন্তত গায়ে থুতু দিয়ে যাবে না। তা ছাড়া, অন্য কারণেও তাঁর দিল্লি যাওয়া চলে না। বাড়ি ফাঁকা থাকলে বেদখল হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

দিল্লিতে আগে বার কয়েক এলেও সেটা ছিল তাঁর কাছে প্রায় অচেনা শহর। সেখানে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ নেই। কলকাতার পরিচিত লোকজন কেউ কেউ অবশ্য ছিল, চাকরি-বাকরির কারণে তারা দিল্লিতে এসেছে, তবে কে কোথায় থাকত

হিরণ্ময় জানতেন না, তাদের খুঁজে বার করার ইচ্ছাও হয় নি। কে জানে হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে বিজলীর খবর সেখানেও পেঁৗছে গেছে কিনা।

দিল্লির আবহাওয়ায় অনেকদিন বাদে সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে পেরেছিলেন হিরণ্ময়। নতুন পরিবেশে অশান্ত বিক্ষিপ্ত মন ধীরে ধীরে স্থির হয়ে আসছিল। ছাত্রছাত্রী, পড়াশোনা, লেখা এবং গবেষণা ইত্যাদি নানা কাজের মধ্যে তিনি ডুবে যেতে শুরু করেছিলেন। মাইনে তো ছিলই, পত্র-পত্রিকায় লেখা এবং প্রকাশকদের কাছ থেকে বই-এর জন্য প্রচুর রয়ালটি আসছিল।

ওল্ড বালিগঞ্জের বাড়িটা ছিল খুবই পুরনো, ভাঙাচোরা। বাবাকে চিঠি লিখে হিরণ্ময় জানিয়েছিলেন, ওটা ভেঙে নতুন বাড়ি যেন তৈরি করা হয়, টাকার অভাব হবে না। বাবারও সেই রকম ইচ্ছাই ছিল। নতুন বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি।

নিজের কাজকর্মের ফাঁকে মাঝে মাঝে মল্লি আর বিজলীকে মনে পড়ে যেত হিরণ্ময়ের। তখন গভীর বিষাদে মনটা ভারী হয়ে উঠত। বিজলী সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ছিল বিচিত্র ধরনের। তীব্র ঘৃণার সঙ্গে অদম্য আকর্ষণ মেশানো। বিজলী তাঁর মারাত্মক ক্ষতি করেছে, তবু তাকে ভুলতে পারছিলেন না তিনি।

এইভাবে বছর দুই কেটে যায়।

দিল্লিতে তিনি থাকতেন ইউনিভার্সিটির হোস্টেলে। খেতেন সেখানকারই ক্যান্টিনে।

ইউনিভার্সিটিতে তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বাঙালি ছিলেন। তাঁদের ভেতর সবচেয়ে আমুদে, সবচেয়ে জনপ্রিয় হলেন বিমলেশ—বিমলেশ দত্তরায়। অক্সফোর্ডের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র, ডক্টরেটও করেছেন ওখান থেকেই। ভদ্র, অমায়িক এবং সুরসিক। ছাত্রছাত্রী থেকে ক্লাস ফোর স্টাফ পর্যন্ত সবার সঙ্গে সমানভাবে মিশতেন।

মনে পড়ে, বিমলেশ যেচে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। প্রায় তাঁরই সমবয়সী। এমন খোলামেলা সহৃদয় মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে বেশি দেরি হয় নি। বিমলেশরা থাকতেন (এখনও

আছেন) চিত্তরঞ্জন পার্কে। সেখানে বিমলেশদের নিজস্ব বাড়ি। প্রায়ই হিরণ্ময়কে বাড়িতে টেনে নিয়ে যেতেন তিনি। গেলে ডিনার বা লাঞ্চ না খাইয়ে কোনোদিন ছাড়তেন না। ছুটির দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত থাকতে হত।

ওখানেই বিমলেশের বোন রমলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। হিস্ট্রিতে এম. এ করে দিল্লিরই একটা কলেজে তিনি লেকচারার। স্বভাবটা দাদার মতোই—তেমনই প্রাণবন্ত, হাসিখুশি আর আমোদপ্রিয়। অন্তত সেই সময় তেমনই ছিলেন।

বিমলেশদের ফ্যামিলিটা মোটামুটি ছোটই। স্ত্রী, একটি ছেলে, রমলা, বৃদ্ধা মা আর বিমলেশ নিজে—সব মিলিয়ে পাঁচজন। ওঁর স্ত্রী রেণুকা তামিলনাড়ুর মেয়ে—বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ফরেন ডিগ্রি ছিল তাঁর, তখন দিল্লিতে একটা বড় মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির সেক্রেটারি হিসেবে চাকরি করতেন। কথায় বার্তায় ব্যবহারে ভদ্রমহিলা চমৎকার। স্বামী-স্ত্রীর এমন মিল খুব কম দেখা যায়।

গোড়ার দিকে খানিকটা সঙ্কোচ থাকলেও পরে বিমলেশদের বাড়িতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন হিরণ্ময়। ওখানকার সবাইকেই তাঁর ভাল লাগত, বিশেষ করে রমলাকে। রমলাও যে তাঁকে অন্যরকম চোখে দেখতে শুরু করেছিলেন কিছুদিন চিত্তরঞ্জন পার্কে যাতায়াত করতে করতেই সেটা টের পেয়ে গেছেন তিনি। কিন্তু তখনও বিজলীর সঙ্গে জড়ানো কলকাতা এবং দাম্পত্য জীবনের স্মৃতিটা বুকের ভেতর অদৃশ্য কাঁটার মতো বিঁধে ছিল। রমলার ব্যাপারে খুব বেশি এগুনো উচিত হবে কিনা বুঝে উঠতে পারছিলেন না হিরণ্ময়। একেক বার মনে হত, চিত্তরঞ্জন পার্কে যাওয়াটা বন্ধ করে দেবেন। রমলাকে নিয়ে নতুন করে জড়িয়ে পড়লে আবার কি সমস্যা দেখা দেবে কে জানে। কিন্তু এই মেয়েটি স্বভাবের দিক থেকে বিজলীর একেবারে বিপরীত। বিজলীর মধ্যে ছিল এক ধরনের সর্বনাশা ঝড়, রমলার মধ্যে ছিল শান্ত ঝলমলে এক মাধুর্য। চিত্তরঞ্জন পার্কে আর যাবেন না ভাবলেও ছুটির দিন নিজের অজান্তে কখন যে চলে যেতেন, খেয়াল থাকত না।

এভাবে যাওয়া-আসা করে কতদিন কেটে যেত কে জানে। হঠাৎ একদিন বিমলেশ তাঁকে বলেছিলেন, 'অনেকদিন তো হয়ে গেল। এবার তোমাকে একটা ডিসিসান নিতে হচ্ছে।'

হিরণ্ময় একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছেন, 'কিসের ?'

'রমলার ব্যাপারে।'

'মানে ?'

'এই সিম্পল ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না ?'

বিমলেশের ইঙ্গিতটা এবার ধরতে পারেন হিরণ্ময়, তবে উত্তর দেন না।

বিমলেশ চোখ নাচিয়ে মজাদার একটা ভঙ্গি করে বলেছেন, 'আরে বাবা, আমাকে শ্যালক হিসেবে পেতে তোমার কি আপত্তি আছে ?'

হিরণ্ময় হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, 'কিন্তু—'

তাঁর কাঁধে একটা হাত রেখে বিমলেশ বলেছেন, 'আরে ব্রাদার, তোমার কাছে আমাদের বাড়ির সেণ্টার অফ অ্যাট্রাকসানটি যে রমলা সেটা সবাই ধরে ফেলেছে।'

বিব্রতভাবে কিছু বলতে চেষ্টা করেছিলেন হিরণ্ময় কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বিমলেশ গলার স্বর আরেকটু উঁচুতে তুলেছিলেন, 'এমনকি আমার বুড়ো মা, যাঁর চোখে মাইনাস টুয়েলভ পাওয়ারের লেন্স তাঁকে পর্যন্ত ফাঁকি দিতে পারো নি।' একটু থেমে গভীর গলায় বলেছেন, 'তোমাকে আমাদের আত্মীয় হিসেবে পেলে ভীষণ খুশি হব। রেণুকা তো চাইছে, আসছে মাসেই শুভ কাজটা হয়ে যাক।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর হিরণ্ময় বলেছেন, 'কিন্তু—'

'কী ?'

'রমলারও তো মতামত জানা দরকার। আমার বাবাকে চিঠি লিখতে হবে।'

'রমলার মত না নিয়েই কি তোমাকে বলছি। তার গ্রিন সিগনাল কয়েকদিন আগেই ভায়া রেণুকা জেনে নিয়েছি। তোমার বাবাকে আজই চিঠি লিখে দাও।'

হিরণ্ময় উত্তর দেন নি।

তাঁকে দ্বিধান্বিত দেখে একটু চিন্তিতভাবেই বিমলেশ এবার বলেছেন, 'তোমার কি কোনোরকম আপত্তি আছে?'

হিরণ্ময় বলেছেন, 'না, ঠিক তা নয়। আমার একটা অতীত আছে যা তোমার জানা দরকার।'

বিমলেশ এই ব্যাপারটায় বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেন নি। হেসে হেসে বলেছেন, 'সব মানুষেরই অতীত থাকে। ঠিক আছে, বলে ফেল।'

'একা তোমাকে বললে হবে না। তোমাদের বাড়ির সবার তা জানা উচিত। তারপর তোমাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে এ বিয়েটা হবে কি হবে না।' বলে একটু থেমে আবার শুরু করেছেন, 'আমার জীবনের একটা দিক গোপন রেখে আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়।'

বিমলেশ বলেছেন, 'বেশ, তুমি যখন না বলে ছাড়বে না তখন বল। কবে বলতে চাও?'

'আজই।'

সেদিন সন্ধ্যায় বিমলেশদের বাড়ির ড্রইংরুমে ওদের সবাইকে নিয়ে বসেছিলেন হিরণ্ময়। ধীরে ধীরে বিজলীর সঙ্গে জড়ানো তাঁর জীবনের কয়েকটা বছরের খুঁটিনাটি সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বিমলেশকে বলেছেন, 'এই আমার ব্যাকগ্রাউণ্ড হিস্ট্রি। আশা করি সব শোনার পর তোমাদের মত বদলে যাবে।'

তক্ষুণি কেউ উত্তর দেয়-নি। বেশ কিছুক্ষণ বাদে বিমলেশ বলেছেন, 'আমাদের দুটো দিন সময় দাও।'

হিরণ্ময় হেসেছেন শুধু, কিছু বলেন নি। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন বিজলীর কথা শোনার পর তাঁর সম্বন্ধে ওঁদের উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেছে। রমলার জন্য একটু কষ্ট হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু আরেক দিক থেকে নিজেকে ভারমুক্ত মনে হয়েছিল। অন্তত অতীতকে লুকিয়ে রেখে তিনি অসততা করেন নি।

হিরণ্ময়ের ধারণা হয়েছিল, রমলার ব্যাপারটা ওখানেই চুকে গেছে। বিমলেশরা এ নিয়ে আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবে না।

কিন্তু পরদিন সকাল হতে না হতেই হিরণ্ময়দের হোস্টেলে চলে

এসেছিলেন রমলা। আগে আর কখনও এখানে আসেন নি তিনি।

বিমূঢ়ের মতো হিরণ্ময় শুধু বলতে পেরেছেন, 'আপনি। এত সকালে।'

রমলা স্নিগ্ধ হেসে বলেছেন, 'বা রে.আমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবেন নাকি ? ভেতরে যেতে বলবেন না ?'

খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন হিরণ্ময়। বলেছেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন।'

ঘরে গিয়ে নিজে একটা সোফায় তো বসেইছেন রমলা, তাঁর মুখোমুখি হিরণ্ময়কেও বসিয়েছেন। বেশ খানিকক্ষণ একদৃষ্টে লক্ষ করেছেন হিরণ্ময়কে, এমন মুখচোরা লাজুক মানুষ যে ভূ-ভারতে বেশি নেই, বুঝতে অসুবিধা হয় নি তাঁর।

রমলা ঝকঝকে মেয়ে, তাঁর মধ্যে কোনোরকম সঙ্কোচ বা আড়ষ্টতা নেই। বলেছিলেন, 'আমি কিন্তু চা খেয়ে আসি নি। আপনাদের এখানে ক্যানটিন আছে ?'

হিরণ্ময় বুঝতে পারছিলেন, চা খাওয়াটা আসল ব্যাপার নয়, আবহাওয়াটা সহজ করে নেওয়ার জন্য ওটার কথা বলা। তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আছে। আপনি বসুন, আমি ক্যানটিনে বলে আসছি।' ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েক মিনিট বাদে ফিরে এসেছিলেন হিরণ্ময়।

খুব তাড়াতাড়ি শুধু চা নয়, সেই সঙ্গে ব্রেকফাস্টও এসে গিয়েছিল। খেতে খেতে একসময় রমলা বলেছেন, 'কাল আপনার সব কথা শুনে খুব দুঃখ হচ্ছিল। সারা রাত আমি ওটা নিয়ে ভেবেছি। আই <u>ফিল</u> ফর ইউ।'

শুকনো একটু হেসে হিরণ্ময় বলেছেন,'তাই ভোর হতে না হতেই সহানুভূতি জানাতে এসেছেন ?'

'না।'

'তা হলে ?'

'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, একটা মেয়ে সমস্ত কিছু শোনার পরও একা একা যখন ছুটে আসে তখন তার পেছনে অন্য কারণও থাকে।' বলতে বলতে মুখ নামিয়ে নিয়েছিলেন রমলা।

নতমুখ রমলাকে দেখতে হিরণ্ময়ের বুকের ভেতরটা এক ধরনের আবেগে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল।

মেঝে থেকে চোখ না তুলে রমলা ফের বলেছেন, 'দাদা কাল দু'দিন সময় চেয়ে নিয়েছেন কিন্তু আমার ডিসিসান আনচেঞ্জড। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, আমি এ বিয়েতে রাজী। এটা জানাবার জন্যেই আজ আমার এখানে আসা।'

হিরণ্ময় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। আশ্চর্য এক ঘোরের ভেতর হাত বাড়িয়ে রমলাকে ছুঁয়ে শুধু তাঁর নামটা উচ্চারণ করেছেন, 'রমলা!'

একটা কলেজের লেকচারার রমলা সেই মুহূর্তে অলৌকিক কোনো ম্যাজিকে লাজুক কিশোরী হয়ে গিয়েছিলেন। আরক্ত মুখে আধফোটা গলায় বলেছেন, 'উঁ—'

অনেকটা সময় গাঢ় নৈঃশব্দের ভেতর কেটে যাবার পর রমলা জিজ্ঞেস করেছেন, 'বিজলীর সঙ্গে তোমার কি লিগাল সেপারেসানটা হয়ে গেছে?' সেই তাঁর হিরণ্ময়কে প্রথম তুমি বলা।

রমলার বাস্তববোধ যে অত্যন্ত প্রখর, ওই একটা প্রশ্নেই তা জানা হয়ে গিয়েছিল হিরণ্ময়ের। তিনি বলেছেন, 'না। ওরা কোথায় আছে তাই তো জানি না। ডিভোর্সের নোটিশটা কোথায় পাঠাব?'

'এই ব্যাপারটা কিন্তু ক্লিয়ার করে নেওয়া ভাল। পরে লিগাল কমপ্লিকেশন দেখা দিতে পারে।'

'কী করা যায় বল তো?'

'কী আর, একজন ল'ইয়ারের পরামর্শ নিতে হবে। আমার এক কলিগের হাজব্যান্ড অ্যাডভোকেট। আজ সন্ধেবেলায় আমি তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাব।'

এরপর ছ'মাসের মধ্যে কোর্ট থেকে একতরফা ডিভোর্স পেয়ে গিয়েছিলেন হিরণ্ময়। অবশ্য সে জন্য কিছু ঝঞ্ঝাটও পোয়াতে হয়েছে। বিজলীর ঠিকানা না জানায় ব্রজরাখালবাবুর বাড়িতে আদালত থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল, তা ছাড়া কলকাতার খবরের কাগজগুলোতে ডিভোর্সের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে লেখা হয়েছিল পনের দিনের ভেতর উত্তর না পাওয়া গেলে ধরে নেওয়া

হবে এই বিবাহ বিচ্ছেদে বিজলীর সম্পূর্ণ সায় আছে। কিন্তু উত্তর আসে নি।

এর মধ্যে বাবাকে চিঠি লিখে রমলাদের সম্বন্ধে সব জানিয়ে দিয়েছিলেন হিরণ্ময়। তিনি আপত্তি করেন নি, তবে লিখেছেন সমস্ত দিক ভাল কবে বুঝে হিরণ্ময় যেন বিয়েটা করেন, দ্বিতীয় বার তাঁকে দুঃখ পেতে না হয়।

ডিভোর্সের রায় পাওয়ায় পরের মাসেই বিয়েটা হয়ে গিয়েছিল।

এরপর হোস্টেলে থাকার আর প্রশ্নই ছিল না হিরণ্ময়দের। চিত্তরঞ্জন পার্কেই চমৎকার একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে দিয়েছিলেন বিমলেশ। দিল্লিতে যত দিন হিরণ্ময়রা ছিলেন ওখানেই থাকতেন।

বিয়ের পর জীবনে একের পর এক সাফল্য এসেছে। লেকচারার থেকে তিনি রিডার হয়েছেন, পরে প্রফেসর, হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট। দেশের এবং বিদেশের নানা ইকনমিক জার্নাল আর খবরের কাগজে তাঁর বহু লেখা বেরিয়েছে। নিউ ইয়র্ক আর লণ্ডনের নাম-করা প্রকাশকরা তাঁর বই ছেপেছে। সে সব বই তাঁকে দিয়েছে অঢেল অর্থ আর বিপুল প্রতিষ্ঠা। বাইরের ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে বার বার তাঁর কাছে আমন্ত্রণ আসছিল। এমন একটা সময় গেছে যখন বছরের ছ'মাস ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া আর ফার-ইস্টে ঘুরে ঘুরেই কাটত। তা ছাড়া গভর্নমেন্টের নজরও এসে পড়েছিল তাঁর ওপর। প্ল্যানিং কমিশনের উপদেষ্টা থেকে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের মেম্বার পর্যন্ত নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন বেশ কয়েক বছর। ফাইভ-ইয়ার প্ল্যানের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

এর মধ্যে বাবা মারা গেছেন। টিপু এবং পলার জন্ম হয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর কলকাতার বাড়িটা দেখাশোনার জন্য একজন কেয়ার টেকার রেখে দিয়েছিলেন হিরণ্ময়। বছরে দু-একবার করে কলকাতায় এসে নিজেও বাড়িটা দেখে যেতেন।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিলেন হিরণ্ময়, বিয়ের পর রমলা বিজলীর নাম শুনলে বিরক্ত হতেন। স্বামী তাঁর আগের স্ত্রীকে মনে করে রাখুন, এটা একেবারেই চাইতেন না তিনি। অত্যন্ত

রুচিশীল, শিক্ষিত এবং উদার হলেও বিজলী সম্পর্কে তাঁর মধ্যে এক ধরনের ঈর্ষাই হয়তো কাজ করত।

তারপর বছরের পর বছর কেটে গেছে। দ্বিতীয় বারের সুখী বিবাহিত জীবন, পলা, টিপু, প্রচুর কাজের চাপ, দেশ-বিদেশের অজস্র সম্মান, সাফল্য—সব মিলিয়ে বিজলীর সঙ্গে জড়ানো অতীতটা ক্রমশ তাঁর জীবন থেকে দূরে, বহু দূরে সরে যাচ্ছিল। কত কাল বাদে মনে নেই, বিজলীর আর মল্লির মুখ তাঁর স্মৃতিতে ঝাপসা হতে হতে একসময় অদৃশ্য হয়ে যায়। ওই দু'টি নামের মানুষ যে ক্ষণকালের জন্য তাঁর জীবনে এসেছিল তখন তা আর মনেও করতে পারতেন না হিরণ্ময়।

কিন্তু তিনি ভুলে গেলেও ওরা তাকে ভোলে নি, বিশেষ করে মল্লি। দু'দিন আগে যেন বহুকাল আগের কোনো পূর্বজন্ম থেকে টেলিফোনে মল্লির গলা ভেসে এসেছিল। মল্লি জানিয়েছিল সে খুব বিপন্ন।

বিজলী যেমনই হোক, টিপু এবং পলার মতো মল্লিও তাঁর সন্তান। এই নিষ্পাপ অসহায় মেয়েটা উপেক্ষা ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই পায় নি। দুশ্চরিত্রা মায়ের অপরাধে হিরণ্ময় তাকে মনেও রাখতে চান নি।

কিন্তু এই শেষ বয়সে মল্লির ফোন তাঁকে ব্যাকুল করে তুলেছে। মনে হয়েছে ওর প্রতি তিনি অবিচারই করেছেন। এই মেয়েটার জন্য তাঁর মধ্যে অনেকখানি গোপন মমতা যে জমা ছিল, আগে টের পান নি। আর সেটাই তাঁকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো এখানে ওখানে ছুটিয়ে নিয়ে আজ ধাক্কা মারতে মারতে আনন্দপুর বাসে তুলে দিয়েছে।

জানালার বাইরে দূরমনস্কর মতো তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে দু-চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছিল, হিরণ্ময় টের পান নি।

ছয়

সকালবেলা, সবে রোদ উঠতে শুরু করেছে, লাক্সারি বাস আনন্দপুরে পেঁাছে যায়।

দূরে উত্তর দিকটা জুড়ে ঝাপসা একটা পাহাড়ের রেঞ্জ সিলুয়েট ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার একটু ছোঁয়া এসে লেগেছে এই আনন্দপুরেও। শহরটার পাহাড়ী মেজাজ। রাস্তাঘাট উঁচুনিচু, ঢেউ খেলানো। তার দু'ধারে বেশ কিছু কাঠের বাড়ি চোখে পড়ে, বাদবাকি সবই ইটের দোতলা, তেতলা, এমনকি কয়েকটা হাই-রাইজও রয়েছে।

আনন্দপুরের একদিকে পাহাড়, আরেক দিকে নদী। আর আছে অজস্র গাছপালা। শহরে ঢোকার মুখে কিছু চা-বাগানও দেখা যায়। চারপাশের ঘন সবুজের মাঝখানে আনন্দপুরকে ছবির মতো মনে হয়।

সূর্যোদয়ের অনেক আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল হিরণ্ময়ের। বাইরের দৃশ্যাবলীর দিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিলেন না। এক অচেনা শহরে সম্পূর্ণ ঠিকানাহীন একটি মেয়েকে কিভাবে খুঁজে বার করবেন, সেই চিন্তাটাই তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

লাক্সারি বাসটা একসময় যেখানে এসে থামে সেটা বিরাট বাস টারমিনাস। সেটাকে ঘিরে আনন্দপুরের সবচেয়ে জমজমাট এলাকা। জায়গাটা প্রকাণ্ড চাকার মতো গোলাকার, সাইকেলের স্পোকের মতো অগুণতি রাস্তা এখান থেকে শহরের নানা দিকে ছুটে গেছে।

আনন্দপুর যে রীতিমতো জমকালো, ব্যস্ত শহর সেটা এই সকালবেলাতেও টের পাওয়া যাচ্ছে। এখানে লোকজন প্রচুর, গোটা বাস টারমিনাস আর তার চারপাশ জুড়ে এখনই থিকথিকে ভিড়। সাইকেল রিকশা আর অটো যে কত তার হিসেব নেই।

হিরণ্ময় শুনেছেন, এই শহরের কাছাকাছি, মাত্র আধ কিলো-মিটার দূরে বর্ডার বা সীমান্ত। তবে সেটা যে কোন দিকে তিনি জানেন না, জানার কথাও নয়। আপাতত বর্ডার নিয়ে তাঁর কোনোরকম কৌতূহল নেই। এই মুহূর্তে তাঁর যা দরকার তা হল একটি হোটেল।

বাস থেকে সুটকেশ নিয়ে নেমে টারমিনারের অফিসে একটি কর্মীকে জিজ্ঞেস করতেই সে জানিয়ে দেয়, বাঁ দিকের দুটো রাস্তা ছেড়ে তিন নম্বর রাস্তাটায় ঢুকলে পর পর তিন চারটে হোটেল পাওয়া যাবে।

পুরনো হার্ট অ্যাটাকের কথা ভেবে সুটকেশটা টেনে নিয়ে যাবার ঝুঁকি নিতে সাহস হয় না হিরণ্ময়ের। একটা সাইকেল রিকশা ডেকে তিনি উঠে পড়েন এবং তিন চার মিনিটের ভেতর একটা হোটেলে পৌঁছে যান।

হোটেলটার নাম 'স্কাইলার্ক ইন্টারন্যাশনাল'। ঝকঝকে চার-তলা বাড়ি। ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ে একদিকে রিসপসান, আরেক দিকে লিফট। লিফটটা দেখে আরাম বোধ করেন হিরণ্ময়। সিঁড়ি ভাঙা তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক।

রিসেপসানে আসতেই একটি স্মার্ট চেহারার যুবক হাতজোড় করে বিনীতভাবে হেসে বলে, 'আসুন স্যার, ওয়েলকাম।'

যুবকটির বয়স বেশি নয়, তিরিশের নিচেই হবে। ঝকঝকে চেহারা। তার বুক পকেটে ব্রোঞ্জের সরু ফলকে নাম এবং পরিচয় এভাবে লেখা আছে: নিরঞ্জন চৌধুরী, ম্যানেজার। হিরণ্ময় বলেন, 'থ্যাঙ্ক য়ু। অপনাদের এখানে এয়ার-কন্ডিশানড রুম পাওয়া যাবে?'

'নিশ্চয়ই স্যার। আমাদের এন্টায়ার থার্ড ফ্লোরের সবগুলো রুমেই এসি বসানো।'

'লোডশেডিং কিরকম হয়?'

'দিনে মিনিমাম তিন চার ঘণ্টা। তবে ভয় নেই, আমাদের জেনারেটর আছে।'

ছেলেটি খুব ভদ্র, চটপটে, কথায় বার্তায় চমৎকার। হিরণ্ময় খুশি হন। এমন একটা হোটেল আর এমন একজন ম্যানেজারকে

তিনি আনন্দপুরে আশা করেন নি। বলেন, 'গুড।'

নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করে, 'আর কিছু জানতে চান স্যার?'

'হ্যাঁ। আমার খাওয়া দাওয়ার ভীষণ রেস্ট্রিকসান আছে। ঝাল, তেল-মশলা বেশি খাই না।

'নো প্রবলেম স্যার। আমাদের কুককে আপনার কাছে নিয়ে যাব। আপনি যেমন বলবেন, ঠিক তাই রান্না করে দেবে।'

'আরেকটা কথা—'

'বলুন স্যার।'

'কিছুদিন আগে আমার হার্ট ট্রাবল হয়েছিল। এখানে ভাল ডাক্তার আছে?'

হোটেল রেজিস্টার বার করতে করতে নিরঞ্জন বলে, 'নিশ্চয়ই স্যার। বড় ডাক্তার, ভাল নার্সিং হোম—এখানে সব পাবেন। কলকাতার মতো না হলেও এখানে সবরকম ব্যবস্থাই আছে। আপনার কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না।'

হিরণ্ময় একটু হাসেন, বলেন, 'আমাকে এককোণে একটা ঘর দিতে পারবেন?'

'অবশ্যই স্যার। নিরিবিলি চাইছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'চার তলায় সাউথ ফেসিং একটা ঘর আছে, অন্য সব স্যুইট থেকে একটু দূরে। জোর দিয়ে বলতে পারি ওখানে থাকতে আপনার ভাল লাগবে।'

'হোপ সো।'

'স্যার আপনার নামটা—'

আগে থেকেই হিরণ্ময় ঠিক করে রেখেছিলেন নিজের আসল পরিচয়ে থাকবেন না। বলেন, 'ললিত সান্যাল।'

রেজিস্টারের খোপ-কাটা ঘরে নাম লিখতে লিখতে নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করে, 'যেখান থেকে আসছেন সে জায়গার ঠিকানাটা যদি দয়া করে বলেন—'

এই ব্যাপারটা আগে মাথায় আসে নি হিরণ্ময়ের। মিথ্যে বলার অভ্যাস কোনোকালেই নেই। মুখ দিয়ে নিজের অজান্তে ওল্ড বালিগঞ্জের ঠিকানাটাই বেরিয়ে আসে।

নিরঞ্জন এবার বলে, 'এখানে আসার কারণ ?'

'লিখুন বেড়ানো।'

কার্সিয়াং মিরিক দার্জিলিং থাকতে কেউ আনন্দপুরে বেড়াতে আসবে, এটা যেন ভাবতে পারে নি নিরঞ্জন। কয়েক পলক হিরণ্ময়ের দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে রেজিস্টারে টুকতে থাকে।

হিরণ্ময় ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করেন। ছেলেটা কি তাঁর কথা বিশ্বাস করছে না ?

ফের মুখ তুলে নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করে, 'স্যার আরেকটা প্রশ্ন। কতদিন এখানে থাকার ইচ্ছে ?'

'আপাতত এক উইক। যদি জায়গাটা ভাল লাগে, আরো কিছুদিন থেকে যাব।'

'ভাল লাগবে স্যার। দার্জিলিং কার্সিয়াংয়ের মতো অত না হলেও আনন্দপুরেরও একটা চার্ম আছে। ক'দিন থাকলেই বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, থ্যাঙ্ক ইউ।' বলে রেজিস্টারটা বন্ধ করে একটা বেয়ারাকে ডেকে কী-বোর্ড থেকে চাবি বার করে তার হাতে দিতে দিতে নিরঞ্জন বলে, 'সাহেবের মালপত্র চারশ বাইশ নম্বর কামরায় পোঁছে দাও।' বলে ফের হিরণ্ময়ের দিকে তাকায়, 'স্যার আপনি ওর সঙ্গে যান। সারা রাত বাস জার্নি করে এসেছেন। একটু রেস্ট নিন। আধ ঘণ্টার ভেতর আমি কুককে নিয়ে আপনার কাছে আসছি।'

বেয়ারার সঙ্গে লিফটে করে চারতলার চারশ বাইশ নম্বর ঘরে চলে আসেন হিরণ্ময়। এখানে পা দিয়েই মনটা ভাল হয়ে যায়।

কামরাটা বেশ বড় এবং সোফা ডিভান ড্রেসিং টেবল কুশন দামী পর্দা ইত্যাদি দিয়ে চমৎকার সাজানো। তা ছাড়া একধারে রঙিন টিভিও রয়েছে।

এই ঘরের এক দিক থেকে যতদূর চোখ যায় আদিগন্ত চড়াই উৎরাই-এর গায়ে সবুজ গাছপালা, তারপর টানা পাহাড়ের রেঞ্জ। অন্য দিকে নদী, এই আশ্বিনেও একটানা গম গম আওয়াজ করতে করতে ছুটে চলেছে।

কলকাতা থেকে শ তিনেক কিলোমিটার দূরে এই শহরটায় পলিউসন অনেক কম। পরিষ্কার নির্মল বাতাস ঝিরঝিরে স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে। মাথার ওপর এত বড় নীলাকাশ কলকাতায় দেখা যায় না, বিশাল বিশাল হাই-রাইজ সেখানকার আকাশকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে।

বেয়ারাটা কামরা সাফ করছিল। সামনের লম্বা ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ান হিরণ্ময়। শরৎকালের নরম মায়াবী আলোয় চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই হিরন্ময়ের। কাল বাস-এ ওঠার পর থেকে যে চিন্তাটা তাঁকে অস্থির করে রেখেছে সেটা এই মুহূর্তে তাঁর স্নায়ুমণ্ডলের ওপর প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকে। মল্লিকে কিভাবে খুঁজে বার করবেন? আনন্দপুর কলকাতার তুলনায় নগণ্য হলেও বেশ ছড়ানো শহর। যেদিকে তাকানো যাক, এখানে অগুনতি বাড়িঘর। প্রতিটি বাড়িতে হানা দিয়ে তো জিজ্ঞেস করা যায় না, 'মল্লি নামের কেউ কি এখানে থাকে?'

তাঁর অন্যমনস্কতার মধ্যে ঘর পরিষ্কার করে কখন বেয়ারাটা চলে গিয়েছিল, হিরণ্ময় টের পান নি। হঠাৎ কার ডাকে চমকে মুখ ফেরাতেই দেখতে পান ম্যানেজার নিরঞ্জন চৌধুরী এবং একটি মধ্যবয়সী লোক ডান পাশের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

নিরঞ্জন বলে, 'স্যার, আপনাকে একটু বিরক্ত করলাম। আমাদের হেড-কুককে সঙ্গে করে এনেছি।'

হিরণ্ময়ের মনে পড়ে, ওদের আসার কথা ছিল। দু'জনকে ঘরে নিয়ে গিয়ে ব্রেকফাস্ট থেকে ডিনার পর্যন্ত সমস্ত দিনে যা যা খান, সব জানিয়ে দেন তিনি।

নিরঞ্জন বলে, 'আচ্ছা স্যার, আমরা এখন যাই। আপনি মুখটুখ ধুয়ে নিন, আমি গিয়েই ব্রেকফাস্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে।'

নিরঞ্জনরা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, হিরণ্ময় ডাকেন, 'মিস্টার চৌধুরী, আপনি একটু থেকে যান।'

নিরঞ্জন পায়ে পায়ে হিরণ্ময়ের কাছে চলে আসে। কুকটি চলে যায়।

হিরণ্ময় দ্বিধান্বিতভাবে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি মল্লি বলে এখানকার কাউকে চেনেন?' বলেই মনে হয় প্রশ্নটা ছেলেমানুষের মতো করে ফেলেছেন। শুধু ডাক-নাম দিয়ে হাজার হাজার মানুষের একটি শহরে বিশেষ একজনকে খুঁজে বার করা সম্ভব নয়।

কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থাকে নিরঞ্জন। তারপর বলে, 'মল্লি কী? আমি সারনেমের কথা বলছি। আর ঠিকানা—'

'ঠিকানা বলতে পারব না। তবে বিয়ে না হয়ে থাকলে খুব সম্ভব তার সারনেম হবে সান্যাল।'

'না স্যার, এ নামে কাউকে চিনি না।'

একটু ইতস্তত করে হিরণ্ময় বলেন, 'আচ্ছা, মনোহর বলে এ শহরে কেউ থাকে? সারনেমটা মনে নেই। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে কলকাতায় কনট্রাক্টরি করত।'

নিরঞ্জন বলে, 'এ শহরে লাখ খানেকের ওপর লোক। তার মধ্যে নিশ্চয়ই শ' খানেক মনোহর কি নেই? পুরো নাম-ঠিকানা না পাওয়া গেলে বিশেষ একজন মনোহরকে খুঁজে বার করা মুশকিল।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন হিরণ্ময়, 'ঠিকই বলেছেন। আচ্ছা, পরে আবার দেখা হবে।'

নিরঞ্জন চলে যায়।

হিরণ্ময় অন্যমনস্কর মতো বাথরুমে ঢুকে পড়েন। শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস তিনি গরম জলে স্নান করেন। এখানে তার ব্যবস্থা আছে।

স্নান সেরে, পোশাক বদলে সবে বাথরুম থেকে হিরণ্ময় বেরিয়েছেন, বেয়ারা ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসে। যতক্ষণ তাঁর খাওয়া না হয়, একপাশে অ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

হিরণ্ময় ভেবে রেখেছিলেন, ব্রেকফাস্টের পর রাস্তায় বেরিয়ে পড়বেন। মল্লির জন্য আনন্দপুরে ছুটে এসেছেন, তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। কিন্তু কিভাবে, সেটা বাইরে বেরিয়ে ঠিক করবেন। কিন্তু কাল সারারাত বাসের ঝাঁকুনিতে ভাল ঘুম হয়নি। তাছাড়া একটানা এতটা বাস-জার্নির অভ্যাস নেই তাঁর। খেতে খেতে ক্লান্তিতে ঢুলুনি আসতে থাকে।

খাওয়ার পর ফাঁকা কাপ-প্লেট নিয়ে বেয়ারা চলে যায়। আর হিরণ্ময় হার্ট, ব্লাড সুগার ইত্যাদি নর্মাল রাখার জন্য তিনটে ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে যায়।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন, খেয়াল নেই হিরণ্ময়ের। কার ডাকাডাকিতে চোখ মেলে তাকান। দেখেন, একটি মুখ তাঁর ওপর ঝুঁকে আছে। লোকটি বলে, 'স্যার, বিকেল হয়ে গেছে। এবার উঠুন।'

প্রথমে হিরণ্ময়, বুঝতে পারেন নি তিনি ঠিক কোথায় আছেন, কে-ই বা তাঁর ওপর হুমড়ি খেয়ে ডাকাডাকি করছে। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র, তারপর সব মনে পড়ে যায়। লোকটা 'স্কাইলার্ক ইন্টারন্যাশনাল'-এর ম্যানেজার নিরঞ্জন। ব্যস্তভাবে উঠে বসতে বসতে হিরণ্ময় বলেন, 'ইস, সাঙ্ঘাতিক ঘুমিয়েছি তো।'

নিরঞ্জন বলে, 'স্যার, দুপুর থেকে তিন চার বার এসে আমরা দেখে গেছি। আগে অবশ্য ডাকিনি। বিকেল হয়ে যাওয়ায় ঘুম না ভাঙিয়ে পারলাম না।'

হিরণ্ময় একটু হাসেন, 'শরীর ভীষণ টায়ার্ড ছিল, তাই ওভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'আপনার লাঞ্চ খাওয়া হয় নি। এখন দিয়ে যেতে বলব?'

'না। অবেলায় খেলে শরীর খারাপ হবে। আপনি বরং চিকেন সুপ আর দু'খানা শুকনো টোস্ট পাঠিয়ে দিন, সেই সঙ্গে খানিকটা স্যালাড। আর এক কাপ চা।'

'এক্ষুণি পাঠাচ্ছি।'

নিরঞ্জন চলে যাবার দশ মিনিটের ভেতর খাবার চলে আসে। খেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন হিরণ্ময়।

সাত

পশ্চিম আকাশের ঢাল বেয়ে সূর্য এখন বেশ খানিকটা নেমে গেছে। বাতাসে ঠাণ্ডা ভাবটা কলকাতার থেকে অনেক বেশি।

এখানকার রাস্তা টাস্তা বেশ পরিচ্ছন্ন। দু'ধারের ড্রেন নিয়মিত সাফ করা হয়ে থাকে। এই বিকেলবেলায় চারপাশে প্রচুর লোক-জনও চোখে পড়ছে।

মল্লির খোঁজটা কিভাবে করা যায়? বাড়ি বাড়ি গিয়ে হানা দেবার ভাবনাটা আগেই নাকচ করে দিয়েছেন হিরণ্ময়। হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হয়, মল্লি হয়তো স্কুল কলেজে পড়েছে। আনন্দ-পুরের মতো শহরে ক'টা স্কুল আর কলেজ থাকতে পারে? হিরণ্ময় ঠিক করলেন, সবগুলো স্কুল এবং কলেজে গিয়ে মল্লির খোঁজ করবেন। অবশ্য সবচেয়ে সহজ যে পদ্ধতিতে অচেনা জায়গায় একজনের সন্ধান করা যায় তা হল সোজা থানায় চলে যাওয়া। লোক খুঁজে বার করার নানারকম কৌশল ওদের জানা। কিন্তু সেখানে যাওয়ার ভাবনাটা মাথা থেকে বার করে দিলেন হিরণ্ময়, কেননা থানায় গেলে প্রথমত নানারকম জবাবদিহি করতে হবে। মল্লিকে কেন তাঁর প্রয়োজন, ওর সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক, ইত্যাদি। অনবরত জেরার ফলে নিজের পরিচয়টা শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়বে কিনা কে জানে। তাছাড়া হোটেলে তিনি অন্য নামে আছেন। সেটাও জানাজানি হয়ে যাবার সম্ভাবনা। নাম ভাঁড়িয়ে আনন্দপুরে থাকার কী কারণ তিনি জানাবেন? একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে তখন তাঁকে পড়তে হবে। তার চেয়ে তিনি গোপনে এসেছেন, গোপনেই মল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করে তার সমস্যার সুরাহা করে দিয়ে যাওয়াটাই ভাল। তাঁর আইডেনটিটি ফাঁস হয়ে যাক, এটা কোনোভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়।

আপাতত স্কুল-কলেজেই খোঁজখবর নেওয়া যাক। তারপর না হয় অন্য কিছু ভাবা যাবে। কোনোভাবেই যদি মল্লিকে বার না করা যায় তখন থানার কথা চিন্তা করা যাবে।

রাস্তায় লোকজনকে কলেজ কোথায় জিজ্ঞেস করতে যাবেন, হঠাৎ কোত্থেকে যেন স্লোগান ভেসে আসে। চকিত হয়ে এধারে ওধারে তাকাতে থাকেন হিরণ্ময়। প্রথমে কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছিলেন না, মিনিটখানেক পর চোখে পড়ে, প্রায় শ খানেক গজ দূরে রাস্তাটা যেখানে বাঁক ঘুরে ডাইনে চলে গেছে সেদিক থেকে একটা মিছিল এগিয়ে আসছে। খুব ছোট মিছিল, সব মিলিয়ে

বিশ পঁচিশ জনের বেশি লোক হবে না। সকলেই যুবক, দু'চারটি তরুণীও রয়েছে তাদের ভেতর। কয়েক জনের হাতে প্ল্যাকার্ড।

হিরণ্ময় রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে পড়েন। মিছিলটা কাছাকাছি এসে যাওয়ায় প্ল্যাকার্ডগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সবগুলোতেই বীভৎস চেহারার মানুষের করোটি এবং তার তলায় আড়াআড়ি দুটো হাড় এঁকে নিচে লেখা আছেঃ ড্রাগের নেশা সর্বনাশা। আনন্দপুরকে ড্রাগের হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

মিছিলের স্লোগানগুলোও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

'ড্রাগের চোরাচালান—'

'বন্ধ কর, বন্ধ কর।'

'আনন্দপুরের তরুণ তরুণীদের ধ্বংস করছে কে?'

'মনোহর রক্ষিত, মনোহর রক্ষিত—'

'ড্রাগের চোরা কারবারী মনোহর রক্ষিতকে—'

'জেলে ঢোকাও, জেলে ঢোকাও।'

হিরণ্ময় চমকে ওঠেন, মনে পড়ে যায় বিজলী যার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল সেই মনোহরের পদবী ছিল রক্ষিত। ড্রাগের চোরা কারবারী মনোহর রক্ষিত আর চেতলার সেই দুশ্চরিত্র লম্পট কনট্রাক্টর মনোহর রক্ষিত কি একই লোক?

মিছিলটা এখন আরো কাছে, একেবারে হিরণ্ময়ের গা ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে। যে যুবক যুবতীরা স্লোগান দিচ্ছে তাদের বয়স কুড়ি বাইশের মধ্যে। সবার মুখ উজ্জ্বল এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তবে সবচেয়ে বেশি করে যাকে চোখে পড়ছে সে অন্যদের চেয়ে বড়, বয়সটা তিরিশের মতো। তার নাকমুখ বেশ ধারাল। চওড়া কপাল। রুক্ষ চুল অবহেলায় পেছন দিকে উল্টে দেওয়া। একটু রোগাটে ধরনের চেহারা। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। দেখামাত্রই টের পাওয়া যায়, তার ভেতর ইস্পাতের ফলার মতো অনমনীয় একটা ব্যাপার আছে। মিছিলটার আগে আগে চলেছে সে এবং হাতের মুঠি আকাশের দিকে ছুঁড়ে প্রতিটি স্লোগান শুরু করছে। অন্যেরা একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাকিটা বলে যাচ্ছে।

হিরণ্ময়ের পাশ দিয়ে মিছিলটা এগিয়ে যায়। নিজের অজান্তে তিনি সেটার পেছন পেছন হাঁটতে থাকেন। মিছিলটা যেন অদৃশ্য

বঁড়শিতে তাঁকে আটকে নিয়ে চলছে। মাঝখানে পঁচিশ তিরিশ ফুটের মতো দূরত্ব।

মিছিলটা কোথায় কতদূর যাবে, কে জানে। কেনই বা তিনি লক্ষ্যহীনের মতো এই ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন, প্রথমটা হিরণ্ময় খেয়াল করেন নি। পরে তাঁর মনে হয়, ওদের মুখে মনোহর রক্ষিত নামটাই বুঝিবা তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যদি চেতলার সেই মনোহর রক্ষিত আর এই মনোহর রক্ষিত এক হয়, মিছিলের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে তার ঠিকানা টিকানা পাওয়া যেতে পারে এবং তারই সূত্র ধরে মল্লির খোঁজও মিলতে পারে।

অন্যমনস্কর মতো হাঁটতে হাঁটতে একসময় হিরণ্ময়ের খেয়াল হয় তিনি একাই নন, তাঁর পাশাপাশি মাঝারি হাইটের, নিরেট চেহারার একটি লোকও মিছিলটার দিকে চোখ রেখে হাঁটছে। তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, বং তামাটে, লম্বা ধাঁচের মুখ, দু' চোখে সতর্ক দৃষ্টি। দেখেই টের পাওয়া যায় লোকটা অত্যন্ত ধূর্ত।

হাঁটতে হাঁটতে কয়েক পলক লোকটাকে লক্ষ করেন হিরণ্ময়। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি আনন্দপুরে থাকেন?'

লোকটি ঘাড় ফিরিয়ে হিরণ্ময়ের দিকে তাকায়। বলে, 'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

'আচ্ছা, এ শহরে ড্রাগের চোরাচালান কি খুব বেশি করে হয়?'

লোকটা চকিত হয়ে ওঠে। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ হিরণ্ময়কে দেখতে দেখতে হয়তো তার মনে হয় এই বয়স্ক লোকটা খুবই নিরীহ ধরনের। সে বলে, 'মিছিলের ছোকরাগুলো তো তাই বলছে।'

হিরণ্ময় বুঝতে পারেন, লোকটা তার প্রশ্নের উত্তরটা কৌশলে এড়িয়ে গেল। ড্রাগ চালানের ব্যাপারে খুব সম্ভব সে কোনো মন্তব্য করতে চায় না। তিনি বলেন, 'মনোহর রক্ষিত লোকটা কে?'

এবারও উত্তর না দিয়ে লোকটা বলে, 'আপনি কি এই শহরে থাকেন না?'

'না।'

'কোথায় থাকেন ?'

'কলকাতায়। আজই এখানে এসেছি।'

'ক'দিন থাকার ইচ্ছে ?'

হিরণ্ময় বিরক্ত হন। তিনি একটা কথা জানতে চেয়েছেন, আর এই লোকটা কিনা ক্রিমিনাল ল'ইয়ারদের মতো জেরা করে চলেছে। বলেন, 'এই চার পাঁচ দিন।'

লোকটা তার কানের কাছে মুখ এনে গুজ গুজ করে বলে, 'তা হলে আর এ সবের ভেতর নাক গলাবেন না।' পরম শুভাকাঙ্ক্ষীর মতো সে একটি অতি দামী পরামর্শও দেয়, 'ওয়ার্ল্ডে এমন অনেক ব্যাপার আছে যার সম্বন্ধে কৌতূহল না দেখানোই ভাল।'

আস্তে আস্তে বিমূঢ়ের মতো মাথা নাড়েন হিরণ্ময়। বলেন, 'ব্যাপারটা কি খুবই বিপজ্জনক ?'

লোকটা উত্তর দেয় না।

হিরন্ময় এবার বলেন, 'আপনার পরিচয় জানতে চাইলে কি আপত্তি আছে ?'

লোকটি বলে, 'একেবারেই না। আমার নাম দিবাকর সামন্ত। এখান থেকে একটা ফোর্ট নাইটলি কাগজ বার করি, নাম 'আনন্দপুর বার্তা'। দেশের নানা জায়গার কিছু খবরটবর থাকে কাগজটায়' তবে আমি লোকাল নিউজের ওপর বেশি জোর দিই।'

কেন দিবাকর মিছিলের পেছন পেছন চলেছে, এতক্ষণে বোঝা যায়। হিরণ্ময় তার সম্বন্ধে উৎসুক হয়ে ওঠেন। লোকটা যখন জার্নালিস্ট তখন এখানকার নাড়িনক্ষত্র নিশ্চয়ই ওর জানা। যদিও মনোহরের প্রসঙ্গ দিবাকর এড়িয়ে যেতে চাইছিল, ওকে ধরে থাকলে শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই অনেক খবর পাওয়া যাবে। হয়তো মল্লিকে চেনে দিবাকর, চেনে বিজলীকেও। ওকে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া চলবে না।

একটা ব্যাপার হিরণ্ময় লক্ষ করেছেন, দিবাকর মনোহরকে ভয় পায়। হয়তো গোটা আনন্দপুর জুড়ে মনোহরের একটা ভীতিকর ইমেজ রয়েছে। তাই কি তার সম্বন্ধে তাঁকে অতিরিক্ত কৌতূহলী হতে বারণ করে দিয়েছে দিবাকর ?

হিরণ্ময় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মারাত্মক ব্যাপারটি

ঘটে যায়। কোত্থেকে একটা জিপ হুড়মুড় করে এসে পড়ে! গাড়িটার ভেতর বসে আছে চার পাঁচটা হুলিগান টাইপের ছোকরা। তাদের চোখে প্রকাণ্ড নীল বা কালো গগলস, মাথায় লাল ফেট্টি বাঁধা, পরনে টাইট ফুল প্যাণ্টের ওপর জ্যাকেট। অগুনতি মানুষের সামনে মিছিলটার ওপর পর পর ক'টা বোমা ফাটিয়ে পলকে তারা উধাও হয়ে যায়।

জায়গাটা ধোঁয়ায় ভরে গেছে। চারপাশে ভয়ার্ত লোকজন ঊর্ধ্বশ্বাসে চিৎকার করতে করতে যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাতে থাকে। রাস্তার দু'পাশের দোকানপাটের ঝাঁপ ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে যায়। মুহূর্তে এলাকাটা একেবারে ফাঁকা. সুনসান। লক্ষ করলে হিরণ্ময় দেখতে পেতেন, ধারে কাছে কোথায়ও নেই দিবাকর, বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে উধাও হয়ে গেছে।

বোমা পড়ার সময়টা দিবাকরের দিকে অবশ্য নজর ছিল না হিরণ্ময়ের। আবছাভাবে তাঁর মনে হচ্ছিল, এমন ঘটনা টেক্সাসে বা হলিউডের কোনো অ্যাকসন-প্যাকড ফিল্মে ঘটে থাকে। রাস্তার অন্য সবার মতো তিনি দৌড়ে পালিয়ে যান নি। আসলে কী করবেন সেটা ভেবে পাচ্ছিলেন না। বিহ্বলের মতো সামনের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

মিছিলের ছেলেমেয়েদেব কয়েক জনের গায়ে বোমার টুকরো ঢুকে গিয়েছিল, রক্তে তাদের জামাকাপড় ভেসে যাচ্ছে। তারা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। যারা অক্ষত রয়েছে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'সমীরদাকে মেরে ফেলেছে, মেরে ফেলেছে—'

সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগে হিরণ্ময়ের। সেদিন ফোনে মল্লি জানিয়েছিল তার এবং কোনো এক সমীরের জীবন নাকি বিপন্ন। সেই সমীর আর ছেলেদুটো যার কথা বলছে সে কি এক?

এমন রক্তাক্ত বীভৎস দৃশ্য আগে কখনও দেখেন নি হিরণ্ময়। স্ট্রোক হয়ে যাবার পর তাঁর হার্ট এমনিতেই ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছে। হিরণ্ময়ের হৃৎপিণ্ডে এই মুহূর্তে হাজারটা ঘোড়া ছুটে যাওয়ায় আওয়াজ হতে থাকে।

অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে তিনি ছেলেমেয়েগুলোর দিকে পা

বাড়িয়ে দেন। কাছাকাছি আসতে বোঝা যায়, বেশির ভাগেরই চোট লাগে নি। সবসুদ্ধ পাঁচজন জখম হয়েছে। একজনের চোট অল্প। তিনজনের আঘাত তুলনায় বেশি। তাদের জামা টামা রক্তে মাখামাখি, ওরাই কাতর শব্দ করে গোঙাচ্ছে। সবচেয়ে মারাত্মক চোট পেয়েছে সেই ছেলেটি যে একেবারে সামনে থেকে মিছিলটাকে লীড করে নিয়ে যাচ্ছিল। সে বেহুঁশ হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে। তার উরু এবং কাঁধের কাছ থেকে ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়ে আসছিল। অন্য ছেলেমেয়েগুলো দিশেহারার মতো ছোটাছুটি করতে করতে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে।

হিরণ্ময় উৎকণ্ঠিতভাবে বেহুঁশ ছেলেটাকে দেখিয়ে বলেন, 'ওকে এখানে ফেলে রাখলে তো মরে যাবে। এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যাও।'

এই ব্যাপারটা অনেক আগেই মাথায় আসা উচিত ছিল কিন্তু ছেলেমেয়েগুলো এমনই বিহ্বল হয়ে পড়েছে যে কী করবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না। এবার তারা সাইকেল রিকশা আর অটো ডাকতে থাকে। কিন্তু কোথায় অটো? কোথায় রিকশা? ধারেকাছে তাদের চিহ্নমাত্র নেই। অগত্যা চারটি ছেলে বেহুঁশ যুবকটিকে রাস্তা থেকে তুলে বয়ে নিয়ে ডান পাশের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যায়। যাদের আঘাত কম তাদের বইতে হয় না, অন্যদের কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তারা হাঁটতে থাকে।

হিরণ্ময় ওদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যান। যদিও বেহুঁশ যুবকটির পরিচয় মোটামুটি জানতে পেরেছেন তবু পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্য একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন, 'ওর নাম কী?'

ছেলেটি বলে, 'সমীর—সমীর বর্ধন।'

'কী করে?'

'এখানকার কলেজে পড়ান।'

ছেলেটির কাছ থেকে আরো জানা গেল, সমীর ছাড়া অন্যেরা সবাই ফার্স্ট সেকেন্ড কি থার্ড আর ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রছাত্রী।

হিরণ্ময় একবার ভাবেন, মল্লির কথা ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করবেন কিনা কিন্তু শেষ পর্যন্ত করলেন না। তিনি তো ওদের সঙ্গ

ছাড়ছেন না, পরে কোনো একসময় জেনে নেওয়া যাবে। তাঁর ধারণা ওরা মল্লিকে চেনে।

চুপচাপ খানিকটা হাঁটার পর হিরণ্ময় বলেন, 'হাসপাতাল এখান থেকে কতদূরে ?'

ছেলেটি বলে, 'কাছেই। মিনিট পাঁচেকের ভেতর পেঁাছে যাব।'

'হুলিগানগুলো বোমা মেরে পাঁচজনকে উণ্ডেড করল। এক্ষুণি কেউ থানায় গিয়ে জানাও। ক্রিমিনালগুলো বেশি দূর পালাতে পারে নি। পুলিশ চেষ্টা করলে ওদের ধরে ফেলতে পারবে।'

'কিচ্ছু লাভ হবে না। পুলিশ ওদের টাচ করবে না।'

'তুমি ওদের চেনো নাকি ?

'আমি কেন, আনন্দপুরের সবাই ওদের চেনে।'

'ওরা কারা ?'

'মনোহর রক্ষিতের পোষা মস্তানবাহিনী। যেদিন থেকে আমরা ড্রাগের বিরুদ্ধে মুভমেন্ট শুরু করেছি সেদিন থেকেই মনোহর আমাদের পেছনে মাস্তান লেলিয়ে দিয়েছে। এতদিন শাসাচ্ছিল, আন্দোলন না থামলে খুন করে ফেলবে, তবে গায়ে হাত দেয় নি। আজই প্রথম বোমা ছুঁড়ল।'

হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেন, 'এতগুলো ছেলেকে জখম করল। তবু পুলিশ ওদের বিরুদ্ধে স্টেপ নেবে না ?'

এই প্রথম ছেলেটির মনে হয় যাঁর সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছে তাঁকে চেনে না, আগে কখনও দেখে নি। হিরণ্ময়কে ভাল করে লক্ষ করতে করতে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি এই শহরে থাকেন না ?'

'না। আজই প্রথম এখানে এসেছি।'

'ও। তাই—'

'মানে ?'

'আনন্দপুরে থাকলে বুঝতে পারতেন কেন পুলিশের পক্ষে ওই মাস্তানগুলোকে ধরা সম্ভব নয়। আনহোলি অ্যালায়েন্স বলে একটা কথা আছে, জানেন তো ?'

একটু অবাক হয়ে হিরণ্ময় বলেন, 'জানি। কিন্তু—'

ছেলেটি বলে, 'সবই গিভ অ্যান্ড টেকের ব্যাপার। ইউ গিভ মী সামথিং, আই গিভ ইউ সামথিং। তুমি আমাকে কিছু দিলে আমি তোমাকে প্রোটেকসান দেবো।'

সমস্ত ব্যাপারটা হিরণ্ময়ের কাছে পরিষ্কার হয়ে আসতে থাকে। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই ছেলেটি আবার শুরু করে, 'টাকা—টাকা দিয়েই পুলিশকে ওরা কিনে নিয়েছে। এখানকার মতো এত কোরাপ্ট পুলিশ আর কোথাও পাবেন কিনা সন্দেহ।'

হিরণ্ময়কে এবার বেশ উত্তেজিত দেখায়। তিনি বলেন, 'এ তো ভীষণ অন্যায়! এর বিরুদ্ধে কিছু একটা করা দরকার।'

ছেলেটা অদ্ভুত হাসে, 'করবেটা কে? সমীরদা আমাদের নিয়ে ড্রাগের এগেনস্টে মুভমেন্ট শুরু করেছেন। তার রেজাল্ট কী হল, নিজের চোখেই তো দেখলেন।'

'তবু থানায় একটা ডায়েরি করে রাখা ভাল। একটা রেকর্ড থাকা দরকার।'

'ঠিক আছে, আপনার মতো প্রবীণ মানুষ যখন বলছেন, আমরা থানায় যাব। কিন্তু ওই ডায়েরি পর্যন্তই, তার বেশি কিছুই হবে না। পুলিশ এই বোমাবাজির কেসে স্রেফ চোখ বুজে থাকবে।'

হিরণ্ময় উত্তর দেন না।

কিছুক্ষণ পর অনেকটা স্বগতোক্তির মতোই বলে ওঠে ছেলেটি, 'এই জায়গাটা কয়েক বছর আগে চমৎকার ছিল। কোয়ায়েট, পিসফুল। বর্ডারের কাছাকাছি বলে স্মাগলিং টাগলিং একটু-আধটু যে না হত তা নয়। কিন্তু ড্রাগের চোরাচালানটা আরম্ভ করে ওই মনোহর। তারপরেই এখানে অশান্তির শুরু।'

হিরণ্ময় উৎকণ্ঠিতের মতো শুনে যাচ্ছিলেন। বলেন, 'কিরকম?'

ছেলেটি বলে, 'আনন্দপুরে ফিফটি পারসেণ্ট বাড়িতে এখন ড্রাগ-অ্যাডিক্ট পাবেন। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী আর যুবকদের মধ্যে ড্রাগ কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, ভাবতে পারবেন না। মনোহর নামের ওই ছেলেটা এই শহরের সর্বনাশ তো করছেই, এখান থেকে

গোপনে হেরোইন, ব্রাউন সুগার সারা দেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। স্কাউন্ড্রেলটা আমাদের জেনারেসনকে একেবারে শেষ করে দিল।' একটু থেমে বলে, পুলিশের হেল্প পাওয়া গেলে রাসকেলটাকে শেষ করে দেওয়া যেত।'

হিরণ্ময় এবার আর কিছু বলেন না। ছেলেটিও চুপচাপ তাঁর পাশাপাশি হাঁটিতে থাকে।

হিরণ্ময় ঠিক করতে পারছিলেন না এখন কী করবেন। মোটামুটি বুঝতে পারছিলেন এই ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে মল্লির যোগাযোগ আছে। ওদের মধ্যে তিনটি মেয়ে রয়েছে। এই তিনজনের কেউ কি মল্লি? কিন্তু তা বোধহয় নয়। একটু খুঁটিয়ে লক্ষ করতে মনে হল, ওদের বয়স কুড়ি একুশের বেশি হবে না। কিন্তু হিসেব অনুযায়ী মল্লির বয়স কম করে ছাব্বিশ।

যে ছেলেরা সমীরকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, একসময় তারা নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথাবার্তা শুরু করে দেয়।

'সমীরদার এই অবস্থা, মল্লিদিকে এখনই খবর দেওয়া দরকার।'

'দিবি কী করে? মল্লিদিকে ক'দিন ধরে ওই হারামী মনোহরটা আটকে রেখেছে। এক মিনিটের জন্যও বাড়ি থেকে বেরুতে দিচ্ছে না। কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে গেটের ওধার থেকে দারোয়ান হাঁকিয়ে দিয়ে বলছে, দেখা করার হুকুম নেই।'

'মল্লিদির এখানে আসা দরকার। যেমন করে হোক, তাকে সমীরদার খবরটা জানাতেই হবে। কিন্তু কে যাবে মল্লিদির কাছে?'

যে ছেলেটি হিরণ্ময়ের সঙ্গে একটু আগে কথা বলছিল সে অন্যাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে ওঠে, 'আমি যাচ্ছি।'

আরেক জন বলে, 'খুব সাবধান অলক। মনোহর কেমন লোক জানিস তো। ঝামেলা করতে পারে।'

অলক বলে, 'জানি। কিন্তু ভয়-টয় পেলে চলবে না। যেভাবে হোক মল্লিদিকে নিয়ে আসছি।' বলে সে একরকম দৌড়ুতে দৌড়ুতে ডানপাশের একটা গলিতে পলকে উধাও হয়ে যায়।

অন্য একটি ছেলে পেছন থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'মল্লিদির কাছে যাওয়ার আগে সমীরদার মাকেও খবরটা দিয়ে যাস।'

ওদের কথা শুনতে শুনতে সমস্ত শিরা টান টান হয়ে গিয়েছিল

হিরন্ময়ের। ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে হাসপাতাল পর্যন্ত যাবেন কিনা, এই নিয়ে খানিক আগেও দ্বিধান্বিত ছিলেন। এই মুহূর্তে মনস্থির করে ফেলেন, যাবেন। অলক মল্লিকে আনতে গেছে। যদি আনতে পারে তাঁর প্রথম সন্তানকে দীর্ঘ তেইশ বছর পর দেখতে পাবেন। যে মেয়েটির জন্য কাউকে কিছু না জানিয়ে এতদূর দৌড়ে এসেছেন, যার শিরায় শিরায় তাঁর প্রথম যৌবনের রক্ত বয়ে চলেছে, তাকে দেখার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা বোধ করতে থাকেন হিরন্ময়। প্রায় ঘোরের মধ্যেই ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে তিনি এগিয়ে চলেন।

একসময় সবাই হাসপাতালে পৌঁছে বেহুঁশ সমীরকে ভর্তি করে দেয়। আর যারা অল্প চোট পেয়েছিল এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে তাদের স্টিচ বা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হয়।

হিরন্ময় এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ঢোকেন নি, বাইরের চওড়া করিডরে একটা বেঞ্চে বসে মল্লির জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। অবশ্য তিনি একা নন, করিডরে অন্য ছেলেমেয়েরা থোকায় থোকায় এধারে ওধারে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছে। তাদেরও ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। এমার্জেন্সির ডাক্তাররা তাদের থেকে যেতে বলেছেন। সমীরের যদি অপারেশন হয়, রক্ত দেওয়া দরকার। তা ছাড়া বেশ কিছু ওষুধ বাইরে থেকে কিনে দিতে হবে।

নিজেদের মধ্যে ছেলেমেয়েরা কথা বলছিল ঠিকই কিন্তু বার বার তাদের চোখ এসে পড়ছিল হিরন্ময়ের ওপর। এমন একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর আনন্দপুরের একটি লোকও যখন তাদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষে নি তখন সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি মানুষ তাদের সঙ্গে হাসপাতাল পর্যন্ত এসেছেন, সমীরের জন্য উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছেন, এতে সবাই অভিভূত।

এই সময় একটি ছেলে এগিয়ে সসম্ভ্রমে বলে,'আপনি আমাদের সঙ্গে এসেছেন, এ জন্যে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনাকে আগে দেখেছি বলে তো মনে হয় না।'

হিরন্ময় অলককে যা বলেছিলেন, এই ছেলেটিকেও তাই বলেন, অর্থাৎ তাঁকে আগে দেখার কোনো কারণ নেই, কেননা এ শহরে

তিনি আজই প্রথম এসেছেন।

ছেলেটি বলে, 'আপনার পরিচয়টা জানতে পারলে ভাল লাগত।'

হিরণ্ময় বলেন, 'আমি একজন মাস্টার, তোমাদের মতো ছেলে মেয়েদের পড়াতাম। রিসেন্টলি রিটায়ার করেছি।' তিনি আরো জানান একটি বিশেষ প্রয়োজনে তাঁর এ শহরে আসা। রাস্তায় তাঁর ছেলের বয়সী ক'টি যুবককে বোমার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত হতে দেখে তিনি তাদের ফেলে পালিয়ে যেতে পারেন নি। হাজার হোক তিনি একজন মাস্টারমশাই এবং সন্তানের বাবা। হাসপাতালে আসাটা কর্তব্য বলে মনে করেছেন। এর জন্য কৃতজ্ঞতা জানালে তাঁকে শুধু বিব্রতই করা হবে।

ক্রমে সব ক'টি ছেলেমেয়ের সঙ্গে আলাপ হয় এবং তাদের নাম টামও জানা হয়ে যায়। যুবকদের কারুর নাম তাপস, কারুর মনোজ, কারুর অরুণ, বিজন ইত্যাদি। মেয়ে তিনটির নাম গোপা, বিপাশা আর সুনন্দা।

এমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে একজন ডাক্তার বেরিয়ে এসে বলেন, 'অপারেশন করতে হবে না। সমীরবাবুর জ্ঞান ফিরেছে। রাত্তিরে এই ওষুধগুলো দরকার হবে। কিনে দিয়ে যাবেন।' একটু থেমে বলে, 'বম্ব ইনজুরির কেস। আপনারা ইমিডিয়েটলি থানায় একটা ডায়েরি করুন। আমরা এর ভেতর পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছি।' বলে একটা প্রেসক্রিপসন মনোজ নামের ছেলেটির হাতে দেন।

ওদের কথাবার্তার ভেতর হিরণ্ময় বেঞ্চ থেকে উঠে এসে বলেন, 'আমিও ডায়েরি করার কথা বলেছিলাম।' অবশ্য অলকের মতে থানায় গিয়ে অভিযোগ জানালে যে লাভ হবে না সেটা আর বলেন না।

ছেলেদের মধ্যে কয়েকজন বলে, 'তা হলে থানায় যাওয়া যাক।'

ডাক্তার ফের এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ঢুকে গিয়েছিলেন।

মনোজ বলে, 'সবার থানায় গিয়ে দরকার নেই। সমীরদার মা আর মল্লিদি যদি আসেন, কাউকে না দেখলে খুব চিন্তায় পড়ে যাবেন। অরুণ যাক, বাকিরা এখানেই থাকি।'

'ঠিক আছে।'

হিরণ্ময় একবার ভাবেন, মনোজদের সঙ্গে থানায় যাবেন। পুলিশ ডায়েরিটা সত্যিই নেয় কিনা জানার জন্য ভীষণ কৌতুহল হচ্ছিল তাঁর। পরক্ষণেই খেয়াল হয় যদি মল্লি শেষ পর্যন্ত সব বাধা কাটিয়ে এসে পড়ে? না, এখন হাসপাতালের এই করিডর ছেড়ে তাঁর পক্ষে কোথায়ও যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি ধীরে ধীরে ফের আগের সেই বেঞ্চটায় গিয়ে বসে পড়েন।

মনোজরা চলে আসার খানিকটা বাদেই দু'টি মহিলা উদভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে করিডরে চলে আসে। মহিলাদের একজন বিধবা, তাঁর বেশ বয়স হয়েছে। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, পরনে ধবধবে থান, তিনি অঝোরে কাঁদছেন। অন্যটি তরুণী। তার সর্বাঙ্গে বিজলীর চেহারাটি যেন বসানো। সে যে বিজলীরই মেয়ে বলে দিতে হয় না, দেখামাত্র সনাক্ত করা যায়। মল্লি কাঁদছিল না, তার চোখেমুখে উৎকণ্ঠার সঙ্গে যা মিশে আছে তা হল প্রচণ্ড ক্রোধ এবং আক্রোশ। আরো একটা ব্যাপার লক্ষ করা যাচ্ছে, মল্লির কপালের একটা দিকে নীল হয়ে অনেকখানি জায়গা ফুলে আছে। কণ্ঠার কাছটা থেঁতলে রক্ত ঝরছে, নাক এবং কপালের চামড়া বেশ খানিকটা উঠে গেছে। হিরণ্ময় একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন, অদ্ভুত এক আবেগে তাঁর হৃৎপিণ্ড তোলপাড় হয়ে যেতে থাকে।

মল্লি সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন আছে সমীর? প্রাণের ভয় নেই তো?'

ডাক্তার সমীর সম্পর্কে যা যা বলেছেন সব জানিয়ে মনোজ বলে, 'চিন্তা ক'রো না মল্লিদি। আমার ধারণা, দু-চার দিনের ভেতর সমীরদাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে।'

জোরে শ্বাস টেনে মল্লি বলে, 'আমি জানতাম এরকম কিছু একটা ঘটবে। তবে এখানেই শেষ নয়, ওরা আবার অ্যাটাক করবে।'

সমীরের মা সমানে কেঁদেই যাচ্ছেন। আবছা গলায় বলেন, 'সমুকে কি একবার দেখতে দেবে?'

মনোজ বলে, 'মনে হয় না। তবু জিজ্ঞেস করে দেখি।' বলে সে কয়েক পা এগিয়ে এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টের বন্ধ দরজায় টোকা দিতে থাকে।

একটু পর আগের সেই ডাক্তারটি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন, 'কী ব্যাপার ?'

সমীরের মায়ের আর্জিটা জানিয়ে দেয় মনোজ।

ডাক্তার বলেন, 'সমীরবাবুকে ইঞ্জেকসান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। আজ না, কাল এসে দেখবেন। আর যে ওষুধগুলোর কথা লিখে দিয়েছি সেগুলো কিনে দিয়ে আপনারা আজ চলে যান।' বলে তিনি ফের এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে ঢুকে পড়েন।

মনোজ ফিরে আসে। ডাক্তারের সঙ্গে তার যা কথা হল সবই শুনতে পেয়েছেন সমীরের মা। ছেলেকে দেখার জন্য আর কাকুতি মিনতি করেন না।

খানিক দূরে বসেছিলেন হিরণ্ময়। কোনোদিকেই তাঁর লক্ষ্য নেই, কারুর কোনো কথা তাঁর কানে ঢুকছে না। একইভাবে পলকহীন মল্লির দিকে তাকিয়ে আছেন।

কতকাল পর নিজের প্রথম সন্তানকে দেখলেন হিরণ্ময়! সেই তিন বছরের শিশুটি আজ ছাব্বিশ বছরের পরিপূর্ণ তরুণী। কী সুন্দরই না দেখতে হয়েছে মল্লিকে। বুকের ভেতরটা উথল-পাথল হয়ে যেতে থাকে হিরণ্ময়ের। কিন্তু মেয়েটার মুখে রক্ত আর আঘাতের চিহ্ন কেন? কেউ কি ওকে মেরেছে? হিরণ্ময় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

ঘণ্টা দেড় দুই আগেও তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না, ঠিক কোথায় গেলে মল্লির খোঁজ পাওয়া যাবে। কিন্তু কী আশ্চর্যভাবেই না তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! শুধু মল্লিই না, সমীরকেও তিনি চিনতে পেরেছেন। কার জন্য তাদের জীবন বিপন্ন, বিপদের আসল কারণ কী, তাও তাঁর জানা হয়ে গেছে।

হিরণ্ময় বসে থাকতে পারছিলেন না, বুকের ভেতরকার সেই আবেগটা তাঁকে ধাক্কা মারতে মারতে মল্লির দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছিল। তাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল এখনই মল্লিকে নিজের পরিচয়টা জানিয়ে দেন। পা বাড়াতে গিয়ে থমকে যান হিরণ্ময়। না, এখন তার সময় নয়, এত লোকজনের সামনে সেটা বলা যাবে না। তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। মল্লিকে আলাদাভাবে পাওয়া দরকার।

হিরণ্ময় ছাড়া অন্য কেউ এতক্ষণ ভাল করে মল্লিকে লক্ষ করে নি। তাপস কী যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ চমকে ওঠে, 'এ কী মল্লিদি, তোমার কপাল ফুলে উঠেছে, কপালে গলায় রক্ত! কী হয়েছে?'

অন্য সবার চোখও এসে পড়ে মল্লির ওপর। তারাও উদ্বিগ্ন মুখে তার আঘাতের কারণ জানতে চায়।

মল্লির দু চোখ জ্বলে ওঠে। সে তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'জানো না, কোথায় কার কাছে থাকি! আমি যাতে বেরুতে না পারি, সে জন্য পাহারাদার রেখেছে। লোকটা আমাকে আটকাতে চেয়েছিল। ফাঁকি দিয়ে বেরিয়েও এসেছিলাম, হঠাৎ ওর চোখ পড়ে যাই। লোকটা ডেসপারেটলি হাত-পা চালাতে থাকে। ফলে কী হয়েছে দেখতেই পাচ্ছ। আমিও ছাড়িনি, স্কাউণ্ড্রেলটার নাক টাক ফাটিয়ে দিয়েছি।'

মনোজ বলে, 'তা হলে?'

তার প্রশ্নের মধ্যে যে ইঙ্গিতটা ছিল চট করে বুঝে নেয় মল্লি। বলে, 'এই কাণ্ডের পর ওখানে কী করে ফিরে যাব, তা জানতে চাইছ তো?'

'হ্যাঁ। মানে—'

'ওখানে আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই আমার। এবার মনোহর রক্ষিতের সঙ্গে স্ট্রেট কনফ্রনটেসনে নামতে হবে আমাকে। এতে যা হবার হোক।'

ছেলেমেয়েরা মল্লিকে ঘিরে ধরেছিল। তাদের চোখে মুখে একই সঙ্গে উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোয়। মনোজ বলে, 'মনোহর রক্ষিতের বাড়ি ফিরে যাবে না। কোথায় থাকবে ঠিক করেছ?'

মল্লি বলে, 'না। এই তো সবে ওখান থেকে বেরুলাম।'

সবাই চুপ করে থাকে।

মল্লি এবার বলে, 'মনোহর রক্ষিতের ভয়ে কেউ আমাকে শেলটার দেবে বলে মনে হয় না। দেখা যাক, কী হয়।'

তাপস মনোজ এবং আরো দু-তিনটে ছেলে একসঙ্গে বলে ওঠে, 'তুমি আমাদের বাড়ি থাকবে মল্লিদি।'

'তা হয় না।'

'কেন ?'

আসলে দুম করে তাপসরা কেউ তাকে বাড়ি নিয়ে তুললে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যা খুবই অস্বস্তিকর। এরা কেউ চাকরি-বাকরি করে না, সবাই অল্প বয়সের ছাত্র। ওদের কথায় গিয়ে হয়তো দেখবে সে একেবারেই অনভিপ্রেত। এই কথাগুলো তো মুখের ওপর বলা যায় না, তাই মল্লি চুপ করে থাকে।

ছেলেরা কিন্তু নাছোড়বান্দা। তার মল্লিকে রাজী হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে.

মল্লি একটু হাসে, কিছু বলে না। আসলে তার জন্য কেউ অসুবিধায় পড়ুক, এটা সে চায় না।

সমীরের মা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার বলেন, 'কোথাও যেতে হবে না। আমি তো আছি, তুমি আমার কাছে থাকবে।'

'কিন্তু—' বলে দ্বিধান্বিতভাবে থেমে যায় মল্লি।

'তুমি ভয় পাচ্ছ, বিয়ের আগে আমাদের ওখানে গিয়ে থাকলে লোকে কুৎসা করবে, এই তো ?'

মল্লি চোখ নামিয়ে নেয়।

সমীরের মা আস্তে আস্তে বলেন, 'যে যা খুশি বলুক, ভাবুক, আমি গ্রাহ্য করি না। তুমি আমার কাছেই থাকবে।'

এই মৃদুভাষী মহিলাটি ছেলের ওপর হামলার খবর পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। খানিক আগে তাঁকে যেভাবে কাঁদতে দেখা গেছে তাতে মনে হয়েছিল, বাংলাদেশের আর দশটা সাধারণ মা যেমন হয় তিনি তাব থেকে আলাদা কিছু নন। কিন্তু এখন ধারণাটা বদলে যাচ্ছে হিরণ্ময়ের। মহিলাটির মধ্যে ইস্পাতের ফলার মতো একটি অনমনীয় ব্যক্তিত্বও রয়েছে।

আরো একটা ব্যাপার হিরণ্ময়ের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, সেটা হল মল্লির সঙ্গে সমীরের সম্পর্ক। কেন ব্যাকুলভাবে মল্লি তাঁকে ফোন করেছিল, এখন সেটা বোঝা যাচ্ছে।

মল্লি সমীরের মাকে বলে, 'কুৎসা ছাড়াও আরেকটা দিকের কথাও ভাবতে হবে।'

সমীরের মা জিজ্ঞেস করেন, 'সেটা কী ?'

'আমি যখন চলে আসি, মনোহর রক্ষিত বাড়ি ছিল না। যখন আমার খবরটা পাবে, তার মাথায় খুন চড়ে যাবে। আমি কোথায় আছি, মাস্তান পাঠিয়ে খুঁজে বার করে আমার ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। শুধু আমরই না, যে আমাকে শেলটার দেবে, তারও। তা ছাড়া সমীরের ওপর ওর মারাত্মক রাগও রয়েছে। আমাকে আপনাদের ওখানে দেখলে আরো খেপে যাবে।' একটু থেমে বলে, 'আজকের রাতটা কোথাও থেকে যাব। কী করা যায়, কাল ঠিক করব।'

চিন্তিতভাবে সমীরের মা জিজ্ঞেস করেন,'কোথায় থাকবে তুমি ?'

'আমার অনেক বন্ধু-টন্ধু আছে, তাদের কারুর বাড়িতে। আজকের রাতটা মনোহর রক্ষিতের লোকেরা আমাকে খুঁজে বার করতে পারবে না।' বলে মনোজের দিকে ফেরে মল্লি, 'প্রেসক্রিপ্‌সানটা কার কাছে আছে ?'

মনোজ বলে, 'আমার কাছে।'

'আমি তো টাকাপয়সা কিছুই আনতে পারি নি। তোমাদের কারুর কাছে ওষুধের দামের মতো টাকা হবে ?'

সমীরের মা টাকা নিয়ে এসেছিলেন। ব্যাগ থেকে তাড়াতাড়ি কয়েকটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে মনোজকে দেন।' মনোজ ওষুধ কিনে কয়েক মিনিটের ভেতর ফিরে আসে।

এমার্জেন্সিতে ওষুধ জমা দিয়ে সবাই যখন হাসপাতাল থেকে বেরুবার তোড়জোড় করছে সেই সময় অলক ফিরে আসে। মল্লি এবং সমীরের মাকে জানায় সে সমীরের খবর দেবার জন্য তাঁদের বাড়ি গিয়েছিল। যাইহোক, তাঁদের এখানে দেখে সে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়।

এদিকে অরুণও থানা থেকে ফিরে এসেছ। সে বলে, 'ডায়েরি করা গেল না। পুলিশ আমাকে ভাগিয়ে দিলে।'

হঠাৎ নিজের অজান্তেই যেন, খানিকটা দূর থেকে হিরণ্ময় অরুণকে বলেন, 'এরকম একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার, পুলিশ ডায়েরি নিলে না! তোমরা তাহলে ঠিকই বলেছিলে—'

সবার, বিশেষ করে মল্লির চোখ এবার এসে পড়ে হিরণ্ময়ের ওপর। এতক্ষণ মনোহরের বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা, বোমার

ঘায়ে সমীরের জখম হওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে সে এতই অস্থির হয়েছিল যে হিরণ্ময়কে ভাল করে লক্ষই করে নি। তাঁকে যে দেখে নি তা নয়। আবছাভাবে ভেবেছিল, এমাজেন্সি ডিপার্টমেন্টে কোনো পেশেন্ট নিয়ে তিনি এসে থাকবেন।

কয়েক পলক তাকিয়ে থাকার পর মল্লির হৃৎপিণ্ড হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। পরক্ষণে এত জোরে লাফাতে থাকে, মনে হয় বুকের ভেতরটা ফেটে চুরমার হয়ে যাবে। বিস্ময়, আনন্দ, অপ্রত্যাশিত চমক—সব মিলিয়ে মানুষের মনে যত রকম আবেগ সৃষ্টি হতে পারে, একের পর এক তার মুখের ওপর ফুটে উঠতে থাকে। অদ্ভুত এক আচ্ছন্নতার মধ্যে সে বলে, 'আপনি—আপনি—মানে—'

হিরণ্ময় বুঝতে পারেন, মল্লি তাঁকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু কিভাবে কে জানে। বেঞ্চ থেকে উঠে এসে চোখের ইশারায় তিনি তাঁকে থামিয়ে দেন।

ওধার থেকে মনোজ বলে ওঠে, 'মনোহরের মস্তানরা যখন বোমা মেরেছিল তখন থেকেই উনি আমাদের সঙ্গে আছেন। এ শহরের একটা হারাম জাদাও এগিয়ে আসেনি, সব কুকুরের মতো পালিয়ে গিয়েছিল। উনি কিন্তু সব সময় আমাদের পাশে থেকে সাহস দিয়ে গেছেন।'

কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিল না মল্লি, অভিভূতের মতো সে শুধু হিরণ্ময়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হিরণ্ময় অলককে জিজ্ঞেস করেন, 'ডায়েরি কেন করা যাবে না, থানা থেকে এ ব্যাপারে কিছু বলল ?'

অরুণ কাছে এগিয়ে এসে বলে, 'আমার মতো একটা কম বয়সের ছোকরার কথায় নাকি মনোহর রক্ষিতের মতো লোকের এগেইনস্টে কোনো অভিযোগ নেওয়া যায় না।'

'কিন্তু এমন একটা মারাত্মক ক্রিমিনাল কেসে ডায়েরি করাতেই হবে। তা ছাড়া সবার কথা শুনে মনে হচ্ছে, মনোহর রক্ষিতের মাসলম্যানরা তোমাদের ওপর হামলা চালাতে পারে। সকলের প্রোটেকসনের ব্যবস্থা পুলিশকে করতেই হবে। আমার সঙ্গে থানায় চল। দেখি এখানে রুল অব ল বলে কিছু আছে কিনা।'

আট

হাসপাতাল থেকে থানা বেশি দূরে নয়। মিনিট সাতেকের ভেতর হিরণ্ময়রা সেখানে পেঁৗছে যান।

সমীরের মা, মল্লি এবং ক'টি ছেলেমেয়ে থানার ভেতরে ঢোকে না, বাইরের রাস্তায় একটা বড় শিরীষ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে। এতজন গিয়ে ভিড় বাড়ানোর দরকার নেই। হিরণ্ময় শুধু ক'টি ছেলেকে সঙ্গে করে ওসি'র চেম্বারে যান।

ওসি থানাতেই ছিলেন। ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা বিপুল চেহারা, চিবুকের তলায় তিন তিনটে চর্বির থাক। বিশাল গোলাকৃতি পেটটা সামনের দিকে হাতখানেক এগিয়ে আছে।

ভিড়ের ভেতর অরুণকে দেখে খুবই বিরক্ত হন ওসি। তার সঙ্গীদের দেখিয়ে রুক্ষ গলায় বলেন, 'এরা কারা?'

হিরণ্ময় সঙ্গে থাকায় অরুণের সাহস বেড়ে গেছে। সে বলে, ওই ডায়েরির ব্যাপারে আমার সঙ্গে এসেছে। আপনি—'

হাত তুলে অরুণকে থামিয়ে দিতে দিতে ওসি বলেন, 'সে তো বুঝতেই পারছি। তোমাকে তো একটু আগেই বলে দিলাম ডায়েরি নেওয়া হবে না। তাই দলবল নিয়ে আমার ওপর প্রেসার ক্রিয়েট করতে এসেছ?'

অরুণ উত্তর দেবার আগে হিরণ্ময় বলে ওঠেন, 'এত বড় মারাত্মক একটা ঘটনা ঘটে গেল, বোমা মেরে পাঁচটা ছেলেকে জখম করা হল। আর আপনি ডায়েরি নেবেন না?'

কড়া চোখে হিরণ্ময়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে ওসি জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কে মশাই?'

'আমার নাম ললিত সান্যাল। আমি ভারতবর্ষের একজন সিটিজেন।'

'আপনি কি এই শহরে থাকেন?'

'না। একটা দরকারে এখানে এসেছি।'

'এই সব ছোকরাদের সঙ্গে জুটলেন কী করে?'

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তিনি কোথায় সমীরদের মিছিল দেখেছেন এবং কিভাবে হঠাৎ জিপে করে এসে হুলিগানরা মিছিলটার ওপর বোমা মেরে পাঁচজনকে জখম করেছে সংক্ষেপে তা জানিয়ে হিরণ্ময় বলেন, 'ছেলেগুলো মারাও যেতে পারত। গুণ্ডারা এমন একটি কাণ্ড ঘটিয়ে পার পেয়ে যাবে, তা হতে পারে না। ডায়েরি আপনাকে নিতেই হবে।'

হিরণ্ময় যা বলেছেন তাতে খেপে ওঠার কথা। কিন্তু ওসি লোকটি অতীব চতুর। অরুণকে ফিরিয়ে দেবার পরও যখন এই প্রবীণ মানুষটি থানায় এসেছেন তখন এর ভেতর গূঢ় কিছু ব্যাপার থাকতে পারে। ভদ্রলোক বললেন, এ শহরে থাকেন না। হতেও পারে। আনন্দপুরের অজস্র মানুষকে তিনি চেনেন। ললিত সান্যালকে আগে দেখেন নি। আজকাল কার সঙ্গে ওপরের লেভেলের লোকেদের যোগাযোগ বা আঁতাত থাকে কে জানে। এই লোকটার যে তেমন কিছু নেই, নিশ্চিতভাবে তা বলা যায় না। কাজেই একটু সতর্ক থাকা ভাল। তা ছাড়া কম বয়সের ছেলে ছোকরাদের যেভাবে হাঁকিয়ে দেওয়া যায়, একজন বয়স্ক লোকের সঙ্গে সে জাতীয় ব্যবহার করা চলে না।

হিরণ্ময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। ওসি একটা চেয়ার দেখিয়ে বলেন, 'বসুন।' হিরণ্ময় বসলে তিনি বলেন, 'আপনি কি জানেন এই ছেলে দু'টো কার বিরুদ্ধে কেস লেখাতে এসেছিল?'

'জানি। মনোহর রক্ষিতের বিরুদ্ধে।'

'মনোহরবাবুর সম্বন্ধে আপনার কোনোরকম ধারণা আছে?'

'সামান্য।'

'তা হলে কি ধরতে হবে এই ছেলেমেয়েগুলোর কথায় আউট অফ সিমপ্যাথি দৌড়ে এসেছেন।'

হিরণ্ময় উত্তর দেন না, শুধু তাকিয়ে থাকেন।

ওসি এবার বলেন, 'মনোহরবাবু খুব বড় বিজনেসম্যান, নাম-করা লোক। এখানকার সবাই তাঁকে চেনে।'

হিরণ্ময় বলেন, 'এ শহরে নাম-করা লোকের বিরুদ্ধে বুঝি ডায়েরি করা যায় না?'

ওসি সচকিত হয়ে ওঠেন, 'তা যাবে না কেন ?'

'তা হলে ?'

'প্রমাণ নেই অথচ এই ছেলেরা মনগড়া ধারণা করে নিয়েছে নোহর রক্ষিত গুন্ডা পাঠিয়ে এদের বোমা মারিয়েছেন। এর ওপর ায়েরি করা যায় ?'

হিরণ্ময় বলেন, 'ওদের তো আরো অভিযোগ আছে।'

ওসি নড়ে চড়ে বসেন, 'যেমন—'

'শুধু বোমা মারার স্কোয়াডই পাঠায় নি মনোহর রক্ষিত, এই ছেলেমেয়েদের বিশ্বাস, তাদের ওপর আবার অ্যাটাক করা হবে। ওদের প্রোটেকশানের কী ব্যবস্থা করবেন ?'

ওসি বলেন, 'আপনাকে তো বললামই মনোহরবাবু এখানকার একজন অত্যন্ত এস্টাব্লিশড পার্সন। মুখের কথায় তাঁর বিরুদ্ধে কেস নেওয়া যায় না। প্রমাণ করতে না পারলে আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।'

ডায়েরি না নেওয়ার পক্ষে যতরকম যুক্তি খাড়া করা যায়, ওসি একটার পর একটা তা করে যাচ্ছেন। হিরণ্ময় এমনিতে নরম প্রকৃতির শান্ত নির্বিরোধ মানুষ! তিনিও ভেতরে ভেতরে বেশ কঠোর হয়ে ওঠেন। বলেন, 'ছেলেগুলো জখম হয়েছে, সেটা কি মিথ্যে ? হাসপাতাল থেকে আপনাকে কিছু জানায় নি ?'

'তা জানিয়েছে।' ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওসি বলেন, 'ঠিক আছে, আপনি যখন এত করে বলছেন, বোমার ব্যাপারে একটা রেকর্ড রেখে দিচ্ছি। তবে এর সঙ্গে মনোহরবাবুর নামটা কিছুতেই জড়াতে পারব না।'

হিরণ্ময় বলেন, 'আর ছেলেমেয়েদের প্রোটেকশানের ব্যাপারটা ?'

অসহিষ্ণুভাবে ওসি এবার বলেন, 'আপনাকে কতবার বলব এভাবে একজন সম্মানিত মানুষের নামে কেস নেওয়া যায় না।'

'ঠিক আছে, আমরা যাচ্ছি। কেসটা নিলে বোধহয় ভাল করতেন।'

থানা থেকে রাস্তায় আসতেই হিরণ্ময় লক্ষ করেন, শিরীষ গাছের নিচে মল্লিরা উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তারা কেউ কোনো প্রশ্ন করার আগেই ওসি'র সঙ্গে কী কথা হয়েছে সংক্ষেপে সব

জানিয়ে বলেন, 'এবার তাহলে যাওয়া যাক। তোমরা বাড়ি ফিরবে তো?'

ছেলেমেয়েরা জানায়, বাড়িতেই ফিরবে।

হিরণ্ময় বলেন, 'আমি হোটেলে ফিরব। একটা সাইকেল রিকশা পেলে ভাল হত।' তিনি কথা বলছিলেন ঠিকই, তবে তাঁর চোখ সারাক্ষণই রয়েছে মল্লির ওপর। মল্লিও পলকহীন তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে।

অলক ডানদিকের একটা রাস্তা দেখিয়ে বলে, 'ওখানে সাইকেল রিকশার স্ট্যান্ড আছে। ওখানে চলুন—'

'চল।'

সবাই হিরণ্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকে। রিকশা স্ট্যান্ডের দিকে যেতে যেতে ছেলেমেয়েরা থানার ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। আর হিরণ্ময় কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ভিড়ের ভেতর মল্লির পাশে চলে আসেন। চাপা গলায় ফিস ফিস করে বলেন, 'আমি হোটেল স্কাইলার্ক-এ উঠেছি। স্যুইট নাম্বার চার শ বাইশ। তুমি আজই ওখানে আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

খানিক পরে রিকশা স্ট্যান্ডে পেঁছে যান হিরণ্ময়। তারপর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটা রিকশায় উঠে বসেন।

নয়

হিরণ্ময় যখন হোটেলে ফিরে এলেন, সাড়ে আটটা বেজে গেছে। কলকাতা থেকে আড়াই শ কিলোমিটার দূরে আনন্দপুরে সাড়ে আটটা মানে অনেক রাত। এর মধ্যেই চারিদিক নিঝুম হয়ে যেতে শুরু করেছে। রাস্তায় লোকজন, গাড়িটাড়ি বিশেষ নেই বললেই হয়। দিনের গমগমে শহরটাকে এখন আর চেনাই যায় না।

এখানে বিদ্যুতের ভোল্টেজ ভীষণ কম। রাস্তায় রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির বাতিগুলো টিম টিম করে জ্বলছে। মনে হয়, আনন্দপুর যেন পরিত্যক্ত ভৌতিক কোনো শহর।

রিকশা ভাড়া মিটিয়ে হোটেল বিল্ডিং-এ ঢুকে প্রথমে ম্যানেজার নিরঞ্জন চৌধুরীর চেম্বারে যান হিরণ্ময়। বলেন, 'আপনি আমার সঙ্গে ওপরে আসতে পারবেন ?'

হিরণ্ময়কে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল নিরঞ্জন। বলে, 'নিশ্চয়ই স্যার।'

'আপনার কাজের কোনো অসুবিধে হবে না তো ?'

'না স্যার। আপনি যেতে বলছেন, নিশ্চয়ই কোনো দরকার আছে। সেটা শোনাও তো আমার কাজেই মধ্যেই পড়ে।'

নিরঞ্জনকে সঙ্গে করে নিজের স্যুইটে এসে হিরণ্ময় বলেন, 'বসুন।' নিরঞ্জনকে বসিয়ে তার মুখোমুখি বসতে বসতে জিজ্ঞেস করেন, 'আমি আপনাকে কতটা বিশ্বাস করতে পারি ?'

নিরঞ্জন প্রথমটায় হকচকিয়ে যায়। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'আপনি যতটা চান ঠিক ততটাই। আমার দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতার কোনোরকম সম্ভাবনা নেই।'

'গুড।' বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন হিরণ্ময়। যেন যা বলতে চান সেটা বলবেন কিনা, সে সম্বন্ধে মনস্থির করতে তাঁর খানিকটা সময় লাগে। তারপর মরিয়া হয়েই বলেন, 'আপনার কাছে একটা ব্যাপারে আমি সাহায্য চাই।'

নিরঞ্জন বলে, 'বলুন আমাকে কী করতে হবে।'

'একটি মেয়ে খুব বিপন্ন। তাকে রক্ষা করা দরকার! আমার এই স্যুইটের কাছাকাছি কোনো রুম কি খালি আছে ?'

'আছে। কিন্তু স্যার—'

হিরণ্ময় নিরঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কী ?'

নিরঞ্জন কয়েক পলক কী ভেবে বলে, 'আপনি কি মেয়েটিকে এখানে আনতে চান ?'

'হ্যাঁ।'

'মেয়েটি কে ?'

'এই শহরেই তার বাড়ি। সে ভীষণ বিপদে পড়েছে।'

'যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?'

'করুন।'

নিরঞ্জন বলে, 'আপনি সকালে বলেছিলেন এ শহরে আপনি প্রথম এসেছেন। অথচ যে মেয়েটির কথা বলছেন তার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হল কী করে?'

এরকম একটা প্রশ্ন নিরঞ্জনের দিক থেকে আসতে পারে সেটা ভাবতে পারেন নি হিরণ্ময়। তিনি চকিত হয়ে ওঠেন। বলেন, 'আপনাকে পরে সব জানাবো। এখন তার সম্বন্ধে কিছু বলা ঠিক হবে না।'

'পুলিশের ঝঞ্ঝাট টঞ্ঝাট কিছু হবে না তো? বুঝতেই পারছেন হোটেলের গুড উইলের একটা ব্যাপার আছে। একবার বদনাম হয়ে গেলে লোকজন এখানে আসবে না।'

'যদি কিছু ঝঞ্ঝাট হয় তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। জোর দিয়ে বলছি আপনার হোটেলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না।'

নিরঞ্জন চুপ করে থাকে। হিরন্ময়ের কথায় রাজী হবে কি হবে না, সে সম্বন্ধে সে খুবই দ্বিধান্বিত। প্রথমত, হিরন্ময়কেই চেনে না নিরঞ্জন। তার ওপর তিনি যে মেয়েটিকে এখানে এনে রাখতে চাইছেন সে কেমন, তার কী পরিচয়, এই শহরে কোথায় থাকে, তা ছাড়া কী ধরনের বিপদে পড়েছে কিছুই জানাতে চাইছেন না হিরণ্ময়। এমন একটা রহস্যময় ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে কিনা, সে ভেবে উঠতে পারছে না।

নিরঞ্জনের মনোভাব বুঝতে পারছিলেন হিরণ্ময়। বলেন, 'আপনি নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তবে আমার আসল পরিচয়টা পেলে করতেন।'

নিরঞ্জনের মাথার ভেতর সব কিছু জট পাকিয়ে যায়। হিরণ্ময়ের আসল পরিচয়টা কী ধরনের? দিশেহারার মতো নিরঞ্জন বলে, 'যদি দয়া করে বলেন আপনি কে—'

'এখনই এ প্রশ্নের উত্তর চাইবেন না। দু'চার দিনের ভেতর সব জানতে পারবেন। আপাতত শুধু এটুকু জেনে রাখুন, যে মেয়েটির কথা বললাম তাকে বাঁচাবার জন্যে আমি আপনাদের শহরে এসেছি।' বলে একটু থেমে আবার শুরু করেন হিরণ্ময়, 'আপনার আপত্তি থাকলে বলুন, আমি অন্য হোটেলে তার থাকার ব্যবস্থা করছি।'

হিরণ্ময়কে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না নিরঞ্জন। সকালে তিনি বলেছেন, আনন্দপুরে তাঁর আসার উদ্দেশ্য বেড়ানো, এখন আবার বলছেন, একটি মেয়েকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এসেছেন। যে কারণেই আসুন হিরণ্ময় এবং সেই মেয়েটিকে নিয়ে যদি পুলিশি হুজ্জত হয় হোটেল স্কাইলার্ক কোনো না কোনো ভাবে জড়িয়ে পড়বে। কেননা হিরণ্ময় এই হোটেলে উঠেছেন। মেয়েটা এখানে এসে থাকলে বাড়তি ঝামেলা আর কতটাই বা হবে? তবে মেয়েটা এলে দু'জনের ওপর নজর রাখতে হবে।

নিরঞ্জন বলে, 'ঠিক আছে স্যার, আপনার কথা বিশ্বাস করছি। আপনার স্যুইটের পাশে একটা রুম আছে। কার নামে বুকিং হবে?'

'আমাব নামে।'

'আচ্ছা স্যার।'

'আমার আরেকটা অনুরোধ আছে।'

'বলুন।'

'মেয়েটির নাম মল্লি। কেউ যদি তার খোঁজ করে, বলবেন ও নামে কোনো বোর্ডার এখানে নেই।'

চিন্তিতভাবে নিরঞ্জন বলে, 'ঠিক আছে। আমি এখন যেতে পারি?' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায়।

'আসুন।' হিরণ্ময় নিরঞ্জনের কাঁধে একটা হাত রেখে বলেন, 'আপনার কোনো ভয় নেই।'

নিরঞ্জন চলে যায়।

কয়েক মিনিটের ভেতর হোটেলের একটা লোক এসে পাশের কামরাটা পরিষ্কার করে বিছানা পেতে হিরণ্ময়কে চাবি দিয়ে যায়।

পাশের ঘরের চাবিটা হাতে আসার আধ ঘণ্টা বাদে সাড়ে ন'টা নাগাদ মল্লি আসে। হিরণ্ময় একটা সোফায় বসে তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

মল্লি প্রথমটা ঘরে ঢোকে না। দরজার সামনে শ্বাসরুদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে অদ্ভুত এক আবেগে তার সারা শরীর ভীষণ কাঁপছে।

হিরণ্ময় কাঁপা গলায় বলেন, 'ভেতরে এস।' খুব সম্ভব মল্লির কাঁপুনিটা তাঁর মধ্যেও ছড়িয়ে গেছে।

নিঃশব্দে ঘরের ভেতর এসে হিরণ্ময়ের দু পায়ের ওপর মাথা রেখে অঝোরে কাঁদতে থাকে মল্লি।

হিরণ্ময় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। মল্লিকে তুলে নিজের পাশে বসিয়ে তার মাথায় এবং পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। মল্লিকে হাসপাতালে দেখার পর থেকে যে আবেগ তাঁকে তোলপাড় করে ফেলছিল সেটাই এখন প্রবল স্রোতে হিরণ্ময়কে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

অনেকক্ষণ কেউ কিছু বলে না। মল্লি বালিকার মতো সমানে কেঁদেই যাচ্ছিল। একসময় ধরা ধরা, ভারী গলায় হিরণ্ময় বলেন, 'কেঁদো না মা, কেঁদো না।'

মল্লির কান্না থামে না, স্নেহ এবং সহানুভূতির ছোঁয়ায় তা আরো উত্তাল হয়ে ওঠে।

আরো কিছুক্ষণ পর দু'জনের আবেগ কিছুটা থিতিয়ে এলে হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি হাসপাতালে আমাকে চিনলে কী করে? তোমার যখন তিন বছর বয়েস তখন আমাকে শেষ দেখেছ। সেই সময়ের কিছুই তো মনে থাকার কথা নয়।'

মল্লি জানায়, তার ছেলেবেলায় খবরের কাগজে যখন হিরণ্ময়ের ছবি বেরুতে মা অর্থাৎ বিজলী সেগুলো দেখিয়ে বলত, এই তোর বাবা। তারপর বড় হয়ে যেখানে হিরণ্ময়ের যত ছবি পেয়েছে সব কেটে কেটে একটা খাতায় সেঁটে রেখেছে মল্লি। তাই চিনতে অসুবিধা হয়নি।

হিরণ্ময়ের চমক লাগে। তাঁকে অস্বীকার করেই তো মনোহর রক্ষিতের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল বিজলী। তাঁর ধারণা ছিল মল্লি মনোহরকেই বাবা বলে জানে। তিন বছরের একটি শিশুর স্মৃতি থেকে হিরণ্ময়ের একেবারে মুছে যাওয়ারই কথা। কিন্তু বিজলী কেন তাকে আসল পিতৃপরিচয় জানিয়ে দিয়েছে? তবে কি মনোহরের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে সে সুখী হয় নি? যদিও এ ব্যাপারে তাঁর প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছিল তবু তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ হয় হিরন্ময়ের। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে তিনি

জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি আমার কলকাতার ঠিকানা আর ফোন নাম্বারটা কোথায় পেলে ?'

মল্লি বলে, 'আপনি দিল্লী থেকে পার্মানেন্টলি কলকাতায় চলে এসেছেন, এ খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল। খবরের সঙ্গে আপনার কলকাতার ঠিকানা আর ফোন নাম্বার ছিল।'

দেখা যাচ্ছে, মল্লি এতদূরে আনন্দপুরের মতো একটা শহরে থাকলেও তার চোখ বরাবরই ছিল তাঁর ওপর। হিরণ্ময় বুকের ভেতর আশ্চর্য এক শিহরণ অনুভব করেন।

একটু চুপচাপ।

তারপর হিরণ্ময় বলেন, 'তোমার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। আগে হাত মুখ ধুয়ে নাও। তারপর খেতে খেতে কথা হবে। চল, তোমার ঘর দেখিয়ে দিই।'

মল্লিকে নিয়ে পাশের কামরায় চলে যান হিরণ্ময়। নিজের হাতে আলো জেবলে বলেন, 'বাথরুমে তোয়ালে সাবান রয়েছে। তোমার হয়ে গেলে আমার স্যুইটে এস।'

মাথা হেলিয়ে মল্লি জানায়—আসবে।

'তোমার সঙ্গে তো আর কোনো জামাকাপড় নেই। যা পরে আছ তা দিয়েই আজকের দিনটা চালিয়ে দাও। কাল দেখা যাবে কী করা যায়।"

'আচ্ছা।'

হিরণ্ময় ফিরে এসে পোশাক বদলে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে একটা সোফায় বসে মল্লির জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন।

কিছুক্ষণ পর মল্লি আসে। হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেন, 'রাত্তিরে তুমি কী খাও ?'

মল্লি জানায়, মনোহরের বাড়িতে যেদিন যা হয় তাই খায়।

হিরণ্ময় বলেন, 'তোমার জন্যে পরোটা, চিকেন কারি, স্যালাড আর মিষ্টি কিছু দিতে বলি ?'

মল্লি চুপ করে থাকে।

অর্থাৎ পরোটা-মাংসের ডিনারে তার আপত্তি নেই। হিরণ্ময় রুম সারভিসে ফোন করে তাঁর জন্য স্পেশাল খাবার আর মল্লির জন্য পরোটা টরোটা আনতে বলেন। তারপর উঠে

গিয়ে একটা ছোট নিচু টেবলের ওপর থেকে ক'টা ট্যাবলেট নিয়ে আসেন।

মল্লি জিজ্ঞেস করে, 'এগুলো কিসের ওষুধ?'

হিরণ্ময় বলেন, 'হার্ট আর ব্লাড সুগারের। ক'বছর আগে আমার একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। তার ওপর হাই ব্লাড সুগার। দু বেলা অনেক ওষুধ খেতে হয়।' বলতে বলতে হঠাৎ খেয়াল হয় জল আনেন নি, জলের জাগটা যে কোথায় রেখে গেছে বেয়ারাটা—'এধারে ওধারে তাকাতে থাকেন হিরণ্ময়।

তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন, মল্লি বলে, 'আপনি বসুন, আমি দেখছি।'

একটু খোঁজাখুঁজি করে ড্রেসিং টেবলের পাশে একটা ছোট টিপয় টেবলের ওপর থেকে জলের জাগ আর গেলাস নিয়ে আসে মল্লি। তারপর গেলাসে জল ঢেলে হিরণ্ময়কে দিতে দিতে বলে, 'রোজ ক'টা ট্যাবলেট খেতে হয়?'

হিরণ্ময় বলেন, 'দশটা। সকালে ব্রেকফাস্টের পর চারটে, দুপুরে দুটো আর রাত্তিরে ডিনারের আগে চারটে।'

ওষুধ খাওয়ার পনের মিনিট পর ডিনার এসে যায়। যে বেয়ারাটি খাবার নিয়ে এসেছে, সঙ্গে করে ছোট বড় ক'টা খালি প্লেট, ন্যাপকিন, কাঁটা-চামচ, এবং জলভর্তি গেলাসও এনেছে। সে টেবলে প্লেট টেলেট নামিয়ে জানায়, এখনই যদি হিরণ্ময়রা খেতে বসেন, সে সার্ভ করবে।

মল্লির হঠাৎ যেন কী হয়ে যায়। সে বলে, 'তুমি যাও। আমরা খেয়ে নেবো'খন।'

বেয়ারাটা চলে যায়।

বিভিন্ন আকারের পাত্রের ঢাকনা খুলে মল্লি দেখতে পায় দু রকমের খাবার রয়েছে। ঝালমশলাহীন স্টু জাতীয় খাদ্যগুলি যে হিরণ্ময়ের, বুঝতে অসুবিধা হয় না মল্লির। সে ক্ষিপ্র হাতে অত্যন্ত সুচারুভাবে প্লেটে প্লেটে খাবার সাজিয়ে বলে, 'গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নিন।'

হিরণ্ময় বলেন, 'এ কি, তুমি খাবে না?'

'আমি পরে খাব।'

'না না, তোমারটাও নিয়ে নাও। একসঙ্গে খাব।'

অগত্যা একটা প্লেটে পরটা এবং চিকেন কারি তুলে নিতে হয় নকে।

মুখ নিচু করে খেতে খেতে মল্লি জিজ্ঞেস করে, 'আপনি বেড-টি ন?'

হিরণ্ময় বলেন, 'বেড-টি বলা যাবে না। আমি খুব ভোরে চ, তখন সূর্যোদয় দেখতে দেখতে দুধ চিনি ছাড়া এক প পাতলা চায়ের লিকার খাই।'

এরপর হিরণ্ময় কখন কখন লাঞ্চ আর ডিনার খান এবং তিন না তাঁকে কী কী ক্যাপসুল এবং ট্যাবলেট খেতে হয়, সব টিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয় মল্লি।

তার কথার উত্তর দিতে দিতে একটু অবাকই হচ্ছিলেন হিরণ্ময়। র লাঞ্চ ডিনারের সময় জানাটা মল্লির কেন প্রয়োজন বুঝতে রছিলেন না। এ নিয়ে তিনি অবশ্য কোনোরকম প্রশ্ন করেন। একসময় বলেন, 'তুমি কী ধরনের বিপদে পড়ে মাকে ফোন করেছিলে, সেটা এখানে এসে কিছু কিছু াতে পেরেছি। সে কথায় পরে আসছি। তার আগে অন্য একটা পার তোমার কাছে জানতে চাই।'

মল্লি উৎসুক চোখে হিরণ্ময়ের দিকে তাকায়।

হিরন্ময় বলেন, 'লাস্ট তেইশ বছর তোমাদের কোনো খবরই মার জানা নেই। এতদিন কোথায় ছিলে, আনন্দপুরে কীভাবে ল, যদি একটু বল—'

মল্লি যা বলে তা এইরকম। চেতলা থেকে তার মা আর সে াহর রক্ষিতের সঙ্গে প্রথমে আসে শ্যামবাজার। সেখানে বছর : কাটিয়ে যায় আসানসোল। আসানসোল থেকে জলপাইগুড়ি । এই আনন্দপুর। বরাবরই মনোহর কনট্রাক্টারি করে এসেছে তু এই বর্ডার টাউনটায় আসার পর ড্রাগের চোরাচালান শুরু র। এখানকার পুলিশ টুলিশকে সে হাত করে নিয়েছে। তা ড়া বিশাল এক মস্তান বাহিনীকে পোষে। খুন খারাপি, ওয়াগন ভা, ব্যাঙ্ক রবারি এদের এদের কাছে জলভাত। এরা না পারে

এমন দুষ্কর্ম নেই। এদের দাপটে মনোহরের বিরুদ্ধে একটা আঙুল তোলার সাহস কারুর নেই।

প্রথম প্রথম ড্রাগের নেশা ধরিয়ে এখানকার যুবকদের সর্বনাশ করছিল মনোহর। তখন তার অ্যাক্টিভিটি আনন্দপুরেই সীমাবদ্ধ ছিল। দু-চার বছর এভাবে চালাবার পর সারা দেশে ড্রাগ চালান দিতে থাকে।

এতবড় একটা ক্রিমিনাল পয়সার জন্য দেশের ক্ষতি করে যাচ্ছে, অথচ কারুর কিছু করার নেই। মুখ বুজে সব সহ্য করতে হচ্ছিল।

এর ভেতর বি. এ পাশ করেছে মল্লি, একটা স্কুলে চাকরিও পেয়েছে।

বছর দুই আগে এখানকার কলেজে লেকচারার হয়ে আসে সমীর। সঙ্গে আসেন তাঁর বিধবা মা। সমীর লক্ষ করে তার ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই ড্রাগ-অ্যাডিক্ট। ড্রাগের নেশা শুধু কলেজের চৌহদ্দিতে আটকে নেই, শহরের অন্য সব তরুণ তরুণীদের ভেতরও ছড়িয়ে পড়েছে। ছেলেমেয়েদের শোধরাবার জন্য সে প্রথম প্রথম তাদের বোঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ড্রাগের সাপ্লাই বন্ধ না হলে তাদের যে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফেরানো যাবে না, এটা বুঝতে পারছিল সমীর। কারা এই মারাত্মক নেশার জিনিস যুগিয়ে যাচ্ছে, খোঁজ করতে গিয়ে সে মনোহরের সন্ধান পায়। প্রথমে সমীর পুলিশকে মনোহরের কথা জানিয়ে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশান নিতে বলে। পুলিশ তো কিছু করেই না, উল্টে সমীরের কথা তাকে জানিয়ে দেয়। প্রথম প্রথম প্রচুর টাকার লোভ দেখিয়ে সমীরের আন্দোলন বন্ধ করতে চেয়েছে মনোহন। কিন্তু সমীর একরোখা আইডিয়ালিস্ট, নিজেকে সে বিকিয়ে দেয় নি।

এত করেও মনোহর কিন্তু সমীরকে দমাতে পারে নি। এই ছেলেটার মধ্যে রয়েছে প্রবল জেদ এবং সাহস। প্রথম প্রথম কলেজের হল-এ সে ড্রাগের বিরুদ্ধে সেমিনার করতে থাকে কিন্তু কোনোদিক থেকেই তেমন সমর্থন পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত

কভাবেই সে মনোহরের বিরুদ্ধে আন্দোলনটা কলেজ
পাউন্ডের বাইরে নিয়ে আসে। উদ্দেশ্য, সাধারণ মানুষকে এর
ঙ্গ জড়িয়ে ফেলা। প্রতিদিন সকালে প্ল্যাকার্ডে 'ড্রাগের চোরা-
লানদার মনোহর রক্ষিতকে অ্যারেস্ট করতে হবে—' লিখে সেটা
তে করে গোটা শহর ঘুরতে থাকে। এবার তার ওপর মনোহরের
ইভেট মস্তান বাহিনীর হামলা শুরু হয়েছে। প্রথমে শাসানি,
রপর কয়েক বার ট্রাক চাপা দিয়ে খুন করার চেষ্টা—এ সবও ওরা
লিয়েছে। একবার গুলি করেছিল, অল্পের জন্য বেঁচে যায়
মীর।

গোড়ায় সমীর কাউকে সঙ্গে পায় নি। ক্রমশ মানুষের ভয়
াঙতে শুরু করে। একটি দু'টি করে ছেলে তার পাশে এসে
ড়াতে থাকে।

সমীরের সাহস এবং জেদ অবাক করে দিয়েছিল মল্লিকে। এমন
নুষ আগে আর দেখে নি সে। মনোহর পয়সার জন্য একটা
নারেসন ধ্বংস করে দিচ্ছে, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল
মল্লি। এতদিন প্রতিবাদ করার সুযোগ পায় নি। কিছু করতে
পারার জন্য এক ধরনের হতাশা তাকে পেয়ে বসেছিল। এবার
কটা রাস্তা পেয়ে যায় সে। একদিন সমীরের সঙ্গে দেখা করে
নায়, সে তার সঙ্গে আন্দোলনে নামতে চায়। নিজের পরিচয় দিয়ে
ারো বলে, যার বিরুদ্ধে লড়াই সেই মনোহর রক্ষিতের বাড়িতে
াকে সে। মল্লির সাহস এবং দৃঢ়তায় অবাক হয়ে গিয়েছিল
মীর। সেই সঙ্গে কিছুটা সংশয়ান্বিতও। মল্লিকে পাঠিয়ে তার
পর নজরদারি করার জন্য এটা মনোহরের কূট চাল কিনা বুঝতে
ারা যাচ্ছিল না।

মল্লিকে তার আন্দোলনে টেনে নেওয়া কি উচিত হবে? গোড়ায়
বিষয়ে মনস্থির করতে পারে নি সমীর। কিন্তু মল্লি নাছোড়বান্দা।
ন রোজ দু'বেলা তার বাড়িতে হানা দিতে শুরু করেছিল।
াগত্যা একান্ত নিরুপায় হয়েই রাজী হতে হয়েছিল সমীরকে।

তারপর একসঙ্গে আন্দোলন করতে করতে পরস্পরের অনেক
াছে এসে পড়েছিল তারা। সমীর বা মল্লি, একজন আরেকজনকে
াড়া এখন নিজেদের ভবিষ্যৎ আর ভাবতে পারে না।

এই আন্দোলনের ব্যাপারে একেবারে ক্ষেপে উঠেছে মনোহর। এ নিয়ে মল্লির ওপর নির্যাতন কম হয় নি। কিন্তু তাকে কোনো-ভাবেই ঠেকানো যায় নি।

শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে মল্লিকে বাড়িতে আটকে ফেলেছে মনোহর। সে যাতে বেরুতে না পারে সে জন্য একটা পোষা মাস্তানকে পাহারাদার রেখেছে। দিন পনের ধরে চব্বিশ ঘণ্টা মাস্তানটা তার ওপর নজর রাখছিল।

মল্লিকে আটকানোর পর মনোহর ঠিক করেছিল, সমীরকে শেষ করে ফেলবে। সেটা জানার পর ভীষণ ভয় পেয়ে যায় মল্লি। এখানকার থানায় মনোহরের বিরুদ্ধে জানিয়ে লাভ নেই। তারা কোনো কেস নেবে না। তাই সন্ত্রস্ত আতঙ্কগ্রস্ত মল্লি দিশেহারা হয়ে কলকাতায় ফোন করে।

কথা শেষ করে জোরে শ্বাস টানে মল্লি। তারপর বলে, 'একটা ব্যাপার আমি ভেবে পাচ্ছি না।'

হিরণ্ময় বলেন, 'কী ?'

'আপনাকে ফোনে জানাতে পারি নি আমরা কোথায় আছি। কথা শেষ করার আগেই সেই মাস্তানটা টেলিফোন কেড়ে নিয়েছিল। আপনি আনন্দপুরের খবর পেলেন কোথায় ?'

কিভাবে চেতলা এবং কালীঘাটে ঘুরে জগন্নাথের কাছ থেকে এই জায়গাটার হদিশ পেয়েছেন, হিরণ্ময় তা জানিয়ে দেন।

মল্লি জিজ্ঞেস করে, 'আপনি যে এখানে এসেছেন, আর কেউ তা জানে ?'

মল্লি যে রমলা টিপু আর পলার কথা বলছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। হিরণ্ময় আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন, 'না। কাউকে না জানিয়েই চলে এসেছি।'

'কিন্তু—'

'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

মল্লি তবু বলে, 'এভাবে চলে আসায় এখন ওঁরা খুবই চিন্তা করছেন—'

হিরণ্ময় বলেন, 'তা হয়তো করছে। কিন্তু তা ভেবে এখন আর লাভ নেই!' বলে একটু হাসেন।

একটু চুপচাপ।

তারপর মল্লি কুণ্ঠিত মুখে বলে, 'ঝোঁকের মাথায় আপনাকে ফোন করে আমাদের বিপদের কথাটা বলে বোধহয় অন্যায়ই হয়ে গেছে।'

হিরণ্ময় চকিত হয়ে উঠেন, 'কেন?'

মল্লি বলে, 'মনোহর রক্ষিত লোকটা তো ভাল না। আপনি আমার ডাকে এখানে এসেছেন জানতে পারলে সে আপনার ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। তাই—'

হিরণ্ময় হাত তুলে মল্লিকে থামিয়ে দিতে দিতে বলেন, 'আমার ক্ষতি করার সাহস মনোহরের হবে না। আমাকে ডেকে তোমার কোনো অন্যায় হয় নি। যদি এখানে এসে বুঝতাম, তোমরা খারাপ কিছু করছ আমি তক্ষুণি এ শহর ছেড়ে চলে যেতাম। একটা ভয়ঙ্কর চক্রের হাত থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ জেনারেশনকে, আমাদের দেশকে বাঁচাতে চাইছ। এর চেয়ে বড় কাজ আর কী হতে পারে।'

'এখন তা হলে আমরা কী করব?' বলতে বলতে মল্লি হিরণ্ময়ের মুখের দিকে তাকায়।

একটু ভেবে হিরণ্ময় বলেন, 'কয়েকটা দিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। সমীর সুস্থ হয়ে উঠুক, তার সঙ্গে আলোচনা করে একটা প্রোগ্রাম ঠিক করব।'

মল্লি উত্তর দেয় না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন হিরণ্ময়। তারপর দ্বিধান্বিতভাবে বলেন, 'কিন্তু—'

মল্লি জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু কী?'

'মনোহর রক্ষিতের বিরুদ্ধে কড়া স্টেপ নিলে তোমার মায়ের রি-অ্যাকশান কী হবে?'

মল্লি চকিত হয়ে ওঠে। হিরণ্ময়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তারা কেউ বিজলী সম্পর্কে একটি কথাও বলে নি, এমন কি তার নামটা পর্যন্ত মুখে আনে নি। সে জানে হিরণ্ময় তার মাকে ঘৃণা করেন। বিজলী যা করেছে, যেভাবে হিরণ্ময়ের মুখে চুনকালি দিয়েছে তাতে ঘৃণাই তার একমাত্র প্রাপ্য।

মল্লি মুখ নামিয়ে বলে, 'মা তাতে খুশিই হবে। ওই লোকটার জেল বা ফাঁসি হোক, মা মনেপ্রাণে তা চায়।'

হিরণ্ময় কলকাতা থেকে বেরুবার সময় ঠিক করে রেখেছিলেন বিজলী সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কৌতূহল দেখাবেন না। মল্লির কথাগুলো শুনতে শুনতে তিনি হতভম্ব হয়ে যান। তারপর নিজের অজান্তেই যেন বলে ওঠেন, 'কিন্তু একদিন তো তার সঙ্গেই চলে এসেছিল।'

'আমি বড় হবার পর মা আমাকে কতবার বলেছে, এর চেয়ে বড় ভুল জীবনে আর করে নি। যতদিন বেঁচে থাকবে মাকে আক্ষেপ করে যেতেই হবে।

হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেন, 'লোকটা কি খুব দুর্ব্যবহার করে?'

মল্লি বলে, 'এরকম নোংরা বদমাস লোক পৃথিবীতে খুব বেশি জন্মায় নি। জন্তুরও অধম। সে আমাদের, বিশেষ করে মায়ের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করে শুনলে আপনার ভীষণ খারাপ লাগবে।'

হিরণ্ময়ের মন বিষাদে ভরে যেতে থাকে। যাকে জীবন থেকে বাতিল করে দিয়েছেন, দীর্ঘ তেইশ বছর পর যার কথা ভুলেও মনে করতে চান নি সে কি স্মৃতির ভেতর কোনো এক অদৃশ্য কিংখাবের ভেতর থেকে গিয়েছিল? তার প্রতি সামান্য একটু দুর্বলতা কি এখনও রয়ে গেছে? নইলে বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে ওঠে কেন? হিরণ্ময় দূরমনস্কর মতো চুপচাপ বসে থাকেন, মনোহর বা বিজলী সম্পর্কে আর কোনো প্রশ্ন করেন না।

খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল। মল্লি বলে, 'আমি এখন কী করব?'

হিরণ্ময় বলেন, 'কী করব মানে? যতদিন তোমাদের বিপদ না কাটছে, এই হোটেলে থাকবে। যে ঘরের বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এলে ওটা তোমার জন্যে 'বুক' করেছি।' একটু থেমে আবার বলেন, 'এখান থেকে আপাতত তোমার বেরুবার দরকার নেই। আমি হাসপাতালে গিয়ে সমীরের খবর নিয়ে আসব।'

অভিভূতের মতো মল্লি বলে, 'কিন্তু ওই লোকটি যদি বন্দুকবাজ মস্তানদের এখানে পাঠিয়ে দেয়?'

'পাঠিয়ে লাভ হবে না। তোমার খোঁজ যাতে না পায় তার ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। তোমার কোনো চিন্তা নেই।'

কি ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে মল্লি, কিন্তু হিরণ্ময় এ সম্বন্ধে আর কিছু বলেন না। জিজ্ঞেস করে যে জেনে নেবে তেমন সাহস হয় না তার। শেষ পর্যন্ত এটুকু ভেবে মল্লি আশ্বস্ত হয়, হিরণ্ময় যখন তার নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করেছেন তখন ভয়ের কারণ নেই।

হিরণ্ময় বলেন, 'অনেক রাত হল। তোমার ঘরের চাবি নিয়ে যাও। সেই বিকেল থেকে অনেক ঝঞ্ঝাট গেছে। এখন গিয়ে শুয়ে পড়বে।'

মল্লি চাবি নিয়ে উঠতে যাবে, হঠাৎ হিরণ্ময়ের কী মনে পড়ে যায়। বলেন, 'যাবার আগে একটা কাজ কর। বাড়ি থেকে আজ বেরিয়ে আসার পর মাকে ফোন টোন করেছ?'

আস্তে মাথা নাড়ে মল্লি, 'না।'

'ওখানে টেলিফোন আছে।' আঙুল দিয়ে ঘরের এক কোণে নিচু টেবলের ওপর ফোনটা দেখিয়ে দিতে দিতে হিরণ্ময় বলেন, 'মাকে জানিয়ে দাও, তুমি নিরাপদে আছ। নইলে ভীষণ দুশ্চিন্তা করবে। আর হ্যাঁ, এখানে যে এসেছ সেটা ব'লো না। কোনো ভাবে এই হোটেলের খবরটা যদি মনোহর পেয়ে যায় গোলমাল বাধাতে পারে। এক্ষুণি সেটা আমি চাইছি না। আগে সমীরের সঙ্গে কথা বলে লোকটার বিরুদ্ধে স্ট্রাটেজি ঠিক করে নিই, তারপর মনোহর জানুক, আমার আপত্তি নেই। আর হ্যাঁ, মাকে আমার কথা এখন জানিও না।'

মল্লি অবাক হয়ে ভাবে, এই মানুষটির সব দিকে নজর। সে আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা কানে ঠেকিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর কিছু শুনে সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত লাইন কেটে দেয়।

হিরণ্ময় মল্লিকে লক্ষ করছিলেন। একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কী হল?

মল্লি বলে, 'ওই লোকটা ফোন ধরেছিল।'

'কে, মনোহর?'

'হ্যাঁ।'

কেন লাইনটা মল্লি কেটে দিয়েছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না হিরণ্ময়ের।

তিন চার বার ফোন করার পর বিজলীকে ধরতে পারে মল্লি। সে বলে, 'আমার জন্যে চিন্তা ক'রো না'মা। আমি ভাল আছি। ···কোথায় আছি এখন বলতে পারব না।···কাল আবার তোমাকে ফোন করব···এই ধর সকাল সাতটা নাগাদ···তুমি টেলিফোনের কাছাকাছি থেকো।···আচ্ছা, ছেড়ে দিচ্ছি···'

হিরণ্ময় মল্লির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বিজলীর গলা শুনতে না পেলেও সে কী বলেছে মল্লির কথা থেকে সেটা আন্দাজ করা গেছে।

ওদিকে ফোন নামিয়ে টেবল থেকে পাশের ঘরের চাবিটা তুলে নিয়ে মল্লি বলে, 'আমি যাচ্ছি।'

'আচ্ছা--'

দশ

অভ্যাস অনুযায়ী পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে ব্যালকনিতে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়েন হিরণ্ময়। এখনও ভোর হয়নি, পূবের আকাশে আবছা আলোর একটু আভা ফুটেছে মাত্র। যতক্ষণ সূর্যোদয় না হচ্ছে তিনি পলকহীন দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকবেন।

আস্তে আস্তে একসময় বিরাট সোনালি বলের মতো সূর্য পূব দিকের পাহাড়ী রেঞ্জটার ওধার থেকে উঠে আসে। যখন তিনি এখানে এসে বসেছিলেন, কোথাও সাড়া শব্দ ছিল না, রাস্তাটাস্তা ছিল একেবারে ফাঁকা, শেষ রাতে ঘুমের আরকে এবং কুয়াশায় ডুবে ছিল উত্তর বাংলার নগণ্য এই শহর। এখন আনন্দপুর জেগে উঠতে শুরু করেছে, কিছু কিছু লোকজন বাইরে বেরিয়েও পড়েছে, চারদিকে চাঞ্চল্যের আভাস।

পাহাড়ী দিগন্তের আড়াল থেকে সূর্য পুরোপুরি উঠে এলে

হিরণ্ময় আর বসে থাকেন না। ঘরে আসতেই চোখে পড়ে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসে আছে মল্লি। তিনি যতটা অবাক হন, তার চেয়ে অনেক বেশি হন খুশি। ঘুমকাতুরে রমলা বা পলা কোনোদিন তাঁকে ভোরের চা এনে দিয়েছে কিনা, মনে করতে পারেন না হিরণ্ময়। সূর্যোদয়ের পর এত কাল সীতাই তাঁকে চা দিয়ে গেছে।

হিরণ্ময়ের মনে পড়ে, তিনি কখন কী খান, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাল জেনে নিয়েছিল মল্লি। কেন জেনেছিল, এখন বোঝা যাচ্ছে।

হিরণ্ময় কাছে এসে মল্লির মুখোমুখি বসতে বসতে স্নিগ্ধ হাসেন। বলেন, 'কতক্ষণ চা নিয়ে বসে আছ?'

মল্লি বলে, 'বেশিক্ষণ নয়, মিনিট দশেক।'

'নিশ্চয়ই রুম সারভিসে ফোন করে চা-টা আনিয়েছ?'

'হ্যাঁ।' বলতে বলতে টীপট থেকে কাপে লিকার ঢেলে তার সঙ্গে দুধ এবং সুগার কিউব মিশিয়ে হিরণ্ময়কে দেয়। নিজের জন্যও এক কাপ তৈরি করে নেয়।

চায়ে চুমুক দিয়ে হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেন, 'কাল রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল তো?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয় মল্লি।

কিছুক্ষণ এলোমেলো কথার পর হিরণ্ময় বলেন, 'তোমাদের এখানে দোকান টোকান কখন খোলে?'

'ন'টা নাগাদ। কেন, কিছু দরকার আছে?'

'হ্যাঁ।'

কী দরকার সেটা যখন হিরণ্ময় বিশদভাবে জানান না তখন এ ব্যাপারে প্রশ্ন করাটা ঠিক নয়। মল্লি চুপ করে থাকে।

হিরণ্ময় ঘড়ি দেখে বলেন, 'এখন সাতটা বাজে। আমি ন'টার সময় একবার বেরুব। তুমি হোটেলেই থাকবে।'

'আচ্ছা।' মল্লি আস্তে মাথা নাড়ে।

হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি যে এখানে এসেছ, কেউ জানে?'

'সমীরের মা ছাড়া আর কেউ জানে না।'

'তা হলে ভয়ের কারণ নেই। উনি নিশ্চয়ই কাউকে তোমার খবর দেবেন না।'

'না।'

'ও'রা কোথায় থাকেন ?'

'নর্থ রোডে।'

'সেটা কোথায় ?'

'এখান থেকে মাইলখানেক দূরে।' বলে বাঁ দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দেয় মল্লি।

হিরণ্ময় বলেন, 'রিকশাওয়ালাদের বললে নিশ্চয়ই নিয়ে যেতে পারবে, কী বল ?'

'হ্যাঁ।' মল্লি উৎসুক সুরে বলে, 'আপনি কি সমীরদের বাড়ি যাবেন ?'

'যেতেও পারি।' বলে একটু হাসেন হিরণ্ময়।

মল্লি কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ফোন বেজে ওঠে। হিরণ্ময় উঠে গিয়ে টেলিফোন তুলে নেন, 'কে ?'

'স্যার, আমি নিরঞ্জন।' হোটেল ম্যানেজারের গলা ভেসে আসে।

'কী ব্যাপার ?'

'মিনিট পাঁচেক আগে দু'টো হুলিগান টাইপের ছোকরা এসে জানতে চাইল মল্লিকা সান্যাল বলে কেউ এই হোটেলে উঠেছে কিনা।'

'আপনি কী বললেন ?'

'না বলে দিয়েছি। ওরা চলে যাবার পর আপনাকে ফোন করছি।'

'ঠিক আছে।'

'স্যার আরেক বার আপনাকে ডিসটার্ব করছি। আমরা কোনো বিপদে পড়ে যাব না তো ?'

'না—না—না, আপনাকে তো কালই বলেছি, সমস্ত দায়িত্ব আমার। কোনো ভয় নেই।'

'আচ্ছা স্যার।' নিরঞ্জন লাইন কেটে দেয়।

ফোন নামিয়ে রাখতে রাখতে হিরণ্ময় বলেন, 'মনোহরের লোকেরা তোমার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। এই হোটেলেও কিছুক্ষণ আগে হানা দিয়েছিল।'

মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায় মল্লির। আবছা গলায় সে বলে, 'তা হলে—'

'তা হলে কী?' মল্লির কাঁধে একটা হাত রেখে হিরণ্ময় বলেন: 'চিন্তা ক'রো না, আমি তো আছি।'

হিরণ্ময় ভরসা দিয়েছেন, তবু দুর্ভাবনা থেকে মল্লি মুক্ত হতে পারছিল না। সে চুপ করে থাকে।

কথায় কথায় অনেকটা সময় কেটে যায়।

যতই উৎকণ্ঠা থাক, হিরণ্ময় যে সাড়ে আটটায় ব্রেকফাস্ট করেন সেটা মল্লির মনে আছে। ঘড়িতে যখন আটটা বেজে পনের তখন রুম সারভিসে ফোন করে সে সকালের খাবার দিতে বলে।

ব্রেকফাস্ট এলে পরিপাটি করে সাজিয়ে হিরণ্ময়কে দেয় মল্লি। ড্রেসিং টেবলের ওপর থেকে চারটে ট্যাবলেট এবং ক্যাপসুল নিয়ে এসে একটা প্লেটে রেখে নিজের খাবারও গুছিয়ে নেয়।

কিছুক্ষণ পর ব্রেকফাস্ট সেরে কিছু টাকা নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েন হিরণ্ময়।

এর মধ্যে দোকানপাট খুলে গেছে। হিরণ্ময় একটা বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে মল্লির জন্য গোটা চারেক দামী শাড়ি, ব্লাউজ, রুমাল, পেটিকোট ইত্যাদি কিনে রাস্তায় নেমে অন্যমনস্কর মতো হাঁটতে থাকেন। এখন তিনি কী করবেন? নর্থ রোডে সমীরদের বাড়ি যাওয়া যেতে পারে। মল্লি আর সমীরের সম্পর্কটা তাঁর জানা হয়ে গেছে, মল্লি কিছুই গোপন করে নি। সমীরের মায়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে তাঁর কিছু আলোচনা আছে। এতদিন মল্লির কথা তিনি ভাবেন নি, তাকে ভুলেই গিয়েছিলেন। তেইশ বছর পর মল্লির ডাকে যখন আনন্দপুরে এসেই পড়েছেন তখন তার নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য তাঁকে কিছু করতেই হবে। বিজলী তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কিন্তু মল্লির তো কোনো অপরাধ নেই। পলা আর টিপুর মতো সে-ও তাঁর সন্তান। মল্লির প্রতি কোনোদিন বিন্দুমাত্র কর্তব্যও পালন করেন নি, আগাগোড়া তার ওপর অবিচারই করে এসেছেন, কিন্তু আর নয়।

হাঁটতে হাঁটতে হিরণ্ময়ের হঠাৎ মনে হয়, এখন সমীরের মায়ের কাছে গিয়ে কাজের কাজ কিছু হবে না। আগে যেটা দরকার তা হল মনোহর রক্ষিতকে শায়েস্তা করা। এই বদমাসটাকে গুঁড়িয়ে

দিতে না পারলে মল্লি এবং সমীরের ভবিষ্যৎ কোনোভাবেই নির্বিঘ্ন নয়।

কিন্তু কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে মনোহরকে জব্দ করা যায়? লোকটা যে ড্রাগের চোরা চালানদার এটা তিনি অন্যের মুখে শুনেছেন, কিন্তু তাঁর হাতে কোনো প্রমাণ নেই। প্রমাণ নেই আরো একটা ব্যাপারে। যে হুলিগানেরা কাল বোমা মেরে সমীরদের জখম করেছে তারা যে মনোহরেরই পোষা বন্দুকবাদ্ তাও জানা গেছে মল্লিদের মুখে শুনে। শোনা আর প্রমাণ করা এক কথা নয়। বিশেষ করে হিরণ্ময়ের মতো একটি মানুষের পক্ষে যিনি মাত্র একদিন হল এখানে এসেছেন। মল্লি অবশ্য তাঁকে এ বিষয়ে খানিকটা সাহায্য করতে পারে কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া অন্য দিক থেকে মারাত্মক হবার সম্ভাবনা। বিজলী মনোহরের হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে। মল্লি তাঁকে সাহায্য করছে, এটা জানাজানি হলে মনোহর বিজলীর ক্ষতি করে দিতে পারে।

ভাবতে ভাবতে সমীরের কথা মনে পড়ে যায়। মল্লি জানিয়েছে এই একগুঁয়ে ঘোর আইডিয়ালিস্ট ছেলেটা এককভাবে মনোহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল। প্রথমে একা থাকলেও পরে তার পাশে অনেক ছেলেমেয়ে এসে জড়ো হয়েছে। সাহায্য তার কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। হিরণ্ময় স্থির করে ফেলেন, এখন হাসপাতালে গিয়ে সমীরের সঙ্গে দেখা করবেন। ছেলেটা কাল বোমার ঘায়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাবার কিছুক্ষণ বাদে অবশ্য তার জ্ঞান ফিরে আসে। তার সঙ্গে আলোচনা করে মনোহর সম্বন্ধে স্ট্যাটেজি ঠিক করা ছাড়াও সে কেমন আছে, ওষুধ টোষুধ কী লাগবে, হাসপাতাল থেকে কবে ছাড়া পাবে, ইত্যাদি খবর নেওয়াও দরকার।

হাসপাতালে এসে প্রথমে এনকোয়ারিতে যান হিরণ্ময়। সেখানে মোটামুটি একটা ভিড় জমে আছে। বোঝাই যায়, এরা রোগীদের আত্মীয় স্বজন।

এনকোরারি কাউন্টারে ওধারে একটি তরুণী বসে ছিল, সে হাসপাতাল স্টাফেরই একজন। সে একে একে সবার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে।

ভিড়টা পাতলা হয়ে এলে হিরণ্ময় তরুণীর সামনে গিয়ে দাঁড়ান। জানান, সমীরের সঙ্গে দেখা করতে চান।

তরুণীটি বলে, 'কিন্তু এখন তো ভিজিটিং আওয়ার্স নয়। আপনি বিকেল চারটে থেকে ছ'টার ভেতর আসবেন। তখন দেখা হবে।'

হিরণ্ময় বলেন, 'অনেক দূর থেকে আসছি। ওর সঙ্গে দেখা হওয়া একান্ত দরকার। যদি অনুগ্রহ করে ব্যবস্থা করে দেন।'

তরুণীটি কী ভাবে, তারপর বলে, 'এক মিনিট দাঁড়ান, আমি হাউস সার্জন্ট ডাক্তার চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলি। উনি যদি পারমিসান দেন তবেই ব্যবস্থা হতে পারে।' বলতে বলতে ফোন করে ডাক্তার চক্রবর্তীর অনুমতি নিয়ে নেয়। ফোনটা ফের ক্রেডেলে রাখতে বলে, 'আপনি জেনারেল ওয়ার্ডে যান, সেখানে পঁচিশ নম্বর বেডে সমীরবাবু আছেন।'

জেনারেল ওয়ার্ডটা কোথায়, জেনে নিয়ে হিরণ্ময় সোজা সেখানে চলে যান। পঁচিশ নম্বর বেডের কাছে এসে দেখেন সমীর শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। তার মাথায়, পায়ে এবং হাতে পুরু ব্যাণ্ডেজ। হিরণ্ময়কে দেখে কাগজটা একপাশে রেখে উৎসুক চোখে তাকায় সমীর।

হিরণ্ময় বলেন, 'আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তুমি করে বলছি কিন্তু—'

হিরণ্ময়ের চেহারায় এমন এক ব্যক্তিত্ব রয়েছে যে তাঁকে দেখলেই শ্রদ্ধা হয়। সসম্ভ্রমে সমীর বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না তো!'

'চেনার কথা নয়। আমি কি একটু বসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। এটায় বসুন—' বেডের পাশে একটা উঁচু টুল, সেটা দেখিয়ে দেয় সমীর।

হিরণ্ময় বসতে বসতে বলেন, 'ধন্যবাদ। তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে। তার আগে বল, এখন কেমন আছ?'

সমীর অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলে, 'ভাল। কিন্তু—'

হিরণ্ময় মৃদু হেসে বলেন, 'আমার পরিচয়টা জানার জন্যে তুমি নিশ্চয়ই খুব অস্থির হয়ে উঠেছ—'

সমীর বলে, 'হ্যাঁ, মানে—'

হিরণ্ময় এধারে ওধারে সতর্কভাবে তাকান। হাসপাতালের এই জেনারেল ওয়ার্ডে সারি সারি বেডে অনেক পেশেণ্ট শুয়ে বা বসে আছে কিন্তু কেউ তাঁদের লক্ষ করছে না। হিরণ্ময় গলা নামিয়ে বলেন, 'হিরণ্ময় সান্যাল নামটা কি কখনও শুনেছ?'

সমীর চকিত হয়ে ওঠে, 'অনেক বার। নাম করা ইকনমিস্ট। গভর্নমেণ্টের অর্থনৈতিক বিষয়ের অ্যাডভাইসর ছিলেন বহু বছর। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'মল্লিকা সান্যাল বলে এখানকার একটি মেয়ের কাছে এই নামটা যে কতবার শুনেছি তার ঠিক নেই। আমার বিশ্বাস এখন আমি তাঁর সঙ্গেই কথা বলছি।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন হিরণ্ময়। বোঝা যাচেছ মল্লি তাঁর কথা সমীরকে জানিয়েছে। বলেন, 'ঠিক। তবে আমি এখানে ললিত সান্যাল নামে একটা হোটেলে উঠেছি।'

সমীর বলে, 'ভালই করেছেন। আপনার আসল পরিচয়টা জানাজানি হলে নানারকম প্রবলেম তৈরি হতে পারে।'

সমস্যা বা গোলমাল যে মনোহরই পাকাতে পারে, তার ইঙ্গিত দিয়েছে সমীর। হিরণ্ময় কী বলবেন যখন ভাবছন সেই সময় সমীর বলে ওঠে, 'ক'দিন আগে মল্লি বলছিল আপনাকে ফোন করবে।'

'করেছিল। তার ফোন পেয়েই তো আনন্দপুরে এসেছি।'

'কবে এলেন?'

'কাল সকালে।'

'মল্লির সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে?'

'হয়েছে। সে এখন আমার সঙ্গে একই হোটেলে রয়েছে।'

বিমূঢ়ের মতো তাকায় সমীর। বলে, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ওর সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ হল আপনার?'

কাল এখানে পেঁছুবার পর থেকে এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সংক্ষেপে সব জানিয়ে হিরণ্ময় বলেন, 'মল্লিকে আমার কাছে না এনে উপায় ছিল না।'

আস্তে মাথা নেড়ে সায় দেয় সমীর। কিছুক্ষণ পর বলে, 'কিন্তু এভাবে আপনি কতদিন মল্লিকে নিয়ে হোটেলে থাকতে পারবেন?'

'সে দিকটা আমি ভেবে দেখেছি। এখানে যখন এসেই পড়েছি মল্লির প্রবলেমটার কিছু একটা সুরাহা না করে ফিরব না।'

'সেটা করতে গেলে কী হতে পারে সেটা ভেবে দেখেছেন?'

বুঝতে না পেরে হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেন, 'কিসের কথা বলছ?'

সমীর বলে, 'আপনার আসল পরিচয়টা তখন বেরিয়ে পড়ার সম্ভাবনা। আপনার সঙ্গে মল্লির মায়ের সম্পর্কটা জানাজানি হলে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, ভাবতে পারেন?'

'তুমি স্ক্যাণ্ডালের কথা বলছ?'

'নিশ্চয়ই। আপনি দেশের একজন ভেরি ইমপর্টান্ট পার্সন। স্ক্যাণ্ডাল রটলে আপনার ক্ষতি হয়ে যাবে।

তেইশ চব্বিশ বছর আগের কথা মনে পড়ে যায় হিরণ্ময়ের। তাঁদের মুখে নোংরা পাঁক মাখিয়ে বিজলী যখন মনোহরের সঙ্গে পালিয়ে যায় চারিদিকে এত কুৎসা রটেছিল যে চেতলার বাড়ি বিক্রি করে পালাতে হয়েছিল। তারই জন্য দ্বিতীয় বার স্ক্যাণ্ডালের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

যৌবনের গোড়ার দিকে বিজলীর আচরণে হিরণ্ময় দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এখন এই বাষট্টি বছর বয়সে তাঁর চরিত্রে অনেক দৃঢ়তা এসেছে। এখন তিনি অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্থিতধী একজন মানুষ। গায়ে নতুন করে পাঁক লাগার ভয়ে আজ তিনি কিছুতেই পালাবেন না। মল্লি তাঁর প্রথম সন্তান, এতকাল তার কোনো খোঁজও নেন নি। জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে হঠাৎ যখন মল্লির সঙ্গে একটা যোগাযোগ হয়েই গেছে, কেচ্ছার ভয়ে তেইশ বছর আগের মতো পালিয়ে যাবেন না, জন্মদাতা হিসবে তাঁর দায়িত্বটুকু পালন করবেন। এতে যা হওয়ার হোক।

হিরণ্ময় বলেন, 'আমি কিছু গ্রাহ্য করি না।'

সমীর একটু ভেবে বলে, 'কিন্তু কিভাবে মনোহর রক্ষিতকে ক্রাশ করবেন তা কি ঠিক করেছেন?'

'না। সেই জন্যেই তো তোমার কাছে এলাম।'

একটু চুপচাপ।

তারপর হিরন্ময়ই ফের বলেন, 'তোমাদের আন্দোলনের কথা মল্লিব কাছে শুনেছি, নিজের চোখেও কাল কিছুটা দেখেছি। তোমার কি ধারণা, মনোহর রক্ষিতকে শেষ করে দিতে পারবে?'

সমীর বলে, 'খুব তাড়াতাড়ি কিছু করতে পারব বলে মনে হয় না। অ্যাডমিনিস্ট্রেসন আর পুলিশকে লোকটা হাত করে ফেলেছে। কাল আপনি নিজের চোখেই তো দেখেছেন এতগুলো ছেলেমেয়েকে বোমা মেরে জখম করা হল অথচ থানা ডায়েরি পর্যন্ত নিতে চাইছিল না।'

হিরন্ময় কিছুটা হতাশই হয়ে পড়েন। বলেন, 'একটা লোক এত বড অন্যায় কবে পার পেয়ে যাবে? তাব পানিশমেন্ট হবে না?'

সমীর উত্তর দেয় না।

হিরন্ময় অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন, 'কি, চুপ করে আছ যে?'

সমীর এবার বলে, 'মনোহব রক্ষিতকে শেষ করার একটা বাস্তাই খোলা আছে।'

'কী সেটা?'

'বিবাট জনমত সৃষ্টি করে মনোহরের বিরুদ্ধে মুভমেন্ট করে যাওয়া। সে জন্যে বড় আকারের পীপলস সাপোর্ট পেতে হবে।'

হিরন্ময় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন, 'সেটা তো খুব ভাল কথা। আমার ধারণা এতে জনসমর্থন নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।'

ম্লান হাসে সমীর। বলে, 'এক বছরের চেষ্টায় মাত্র কুড়ি পঁচিশটা ছেলেমেয়েকে আমার পাশে পেয়েছি। গোটা আনন্দপুরকে ইনভলভ করতে কত দিন লাগবে, ভাবতে পারেন?'

চিরকাল লেখাপড়া, গবেষণা, বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রছাত্রী, সেমিনাব, লেখালিখি ইত্যাদি নিয়ে কাটিয়েছেন হিরন্ময়। কিভাবে মানুষকে সংগঠিত করতে হয়, কোন পদ্ধতিতে করতে হয় গণ আন্দোলন, তিনি জানেন না। হঠাৎ তাঁর মধ্যে যেন কী এক প্রতিক্রিয়া ঘটে যায়। বলেন, 'ধর, আমি যদি তোমাদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভাগের বিপদ সম্পর্কে লোকজনকে বোঝাই, বোঝাই মনোহর

কিভাবে তাদের ছেলেমেয়েদের সর্বনাশ করে চলেছে, তাতে কাজ হবে না?'

হিরণ্ময়ের বলার মধ্যে এমন এক আন্তরিকতা এবং আবেগ রয়েছে যা সমীরকে অভিভূত করে। সে বলে, 'আপনার মতো একজন মানুষকে সঙ্গে পেলে আমাদের শক্তি অনেক বেড়ে যাবে। কিন্তু—'

'কী?'

'ডাক্তাররা বলেছেন, আরো কয়েকদিন আমাকে হাসপাতালে থাকতে হবে। আমি যতদিন না সুস্থ হয়ে উঠছি, রাস্তায় বেরুতে পারব না। আমাকে বাদ দিয়ে এই নতুন জায়গায় আপনার পক্ষে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়।'

'সে তো ঠিকই। এখানকার কাউকেই আমি চিনি না। যতদিন না তুমি পুরোপুরি সুস্থ হচ্ছ আমাকে আনন্দপুরে অপেক্ষা করে থাকতে হবে।'

'তা হলে তো খুবই ভাল হয়।'

টুল থেকে উঠে পড়তে পড়তে হিরণ্ময় বলেন, 'তুমি বিশ্রাম কর, আমি চলি। ওবেলা ভিজিটিং আওয়ার্সে আবার এসে তোমার খবর নিয়ে যাব।'

কিন্তু সবে দু'পা এগিয়েছেন হিরণ্ময়, বাধা পড়ে। এই জেনারেল ওয়ার্ডটার দু'ধারে সারি সারি পেশেন্টদের বেড, মাঝখান দিয়ে চওড়া প্যাসেজ। সেই প্যাসেজ ধরে যে লোকটি এগিয়ে আসছে, কাল বিকেলে তাকে সমীরদের মিছিলের পেছন পেছন যেতে দেখেছেন হিরণ্ময়। আলাপ হয়েছিল তার সঙ্গে। নাম দিবাকর সামন্ত, 'আনন্দপুর বার্তা' একটা ফোর্টনাইটলি ম্যাগাজিনের সম্পাদক। সে নিশ্চয়ই খবর টবরের জন্য সমীরের কাছে এসেছে।

পেছন থেকে সমীর খুব নিচু গলায় বলে, 'যে লোকটা এগিয়ে আসছে সে একটা লোকাল কাগজ চালায়। ওকে নিজের পরিচয় দেবেন না। যদি কিছু জিজ্ঞেস করে, শুধু বলবেন, কাল আমি ইনজিওরড হবার পর হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিলেন। আজ কেমন আছি দেখতে এসেছেন। লোকটা কিন্তু ভাল না। মনোহর রক্ষিতের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত একটা অক্ষরও ওর কাগজে

বেরোয় নি। টাকা খাইয়ে ওর মুখ বন্ধ করে রেখেছে মনোহর।'

দিবাকর কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। স্থির চোখে হিরণ্ময়কে লক্ষ করতে করতে বলে, 'কাল আপনাকে রাস্তার দেখেছিলাম না?'

হিরণ্ময় বলেন, 'হ্যাঁ।'

'তা আপনি এখানে?'

সমীর যা যা শিখিয়ে দিয়েছিল সেগুলো প্রায় মুখস্থ বলার মতো বলে যান হিরণ্ময়।

একটুক্ষণ কী ভাবে দিবাকর. তারপর বলে, 'আচ্ছা আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

হিরণ্ময় বলেন, 'কোথায় আব দেখবেন, কালই তো রাস্তায় আমাদের দেখা হয়েছে।'

'না না, কাল নয়, তারও আগে।

হিরণ্ময় ভাবেন, দিবাকর খবরেব কাগজে হয়তো তাঁর ছবি দেখে থাকবে। এই লোকটার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলা নিরাপদ নয়।

লোকটা কাগজ চালায়। কথায় কথায হিরণ্ময়ের পরিচয়টা বেরিয়ে পড়লে নতুন সমস্যা তৈরি হবে।

ব্যস্তভাবে দিবাকরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে দূরে দরজাব দিকে হাঁটতে থাকেন হিরণ্ময়।

কয়েক পলক ভুরু কুঁচকে হিরণ্ময়ের দিকে তাকিয়ে থাকে দিবাকর। তিনি জেনারেল ওয়ার্ডের বাইরে অদৃশ্য হওয়ার পর অন্যমনস্কর মতো সমীরের বেডের দিকে এগিয়ে যায়।

এগার

হাসপাতাল থেকে হিরণ্ময় যখন হোটেলে ফিরে আসেন তখন এগারটা বেজে গেছে।

একতলায় রিসেপসানের উল্টোদিকে ম্যানেজারের চেম্বার। নিরঞ্জন তার চেম্বারেই এখন বসে ছিল। হিরণ্ময়কে দেখে সে ডাকে, 'স্যার, যদি একটু এখানে আসেন—'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' বলতে বলতে হিরণ্ময় ম্যানেজারের কামরায় চলে আসেন। জিজ্ঞেস করেন, 'কিছু দরকার আছে?'

'হ্যাঁ।' চাপা গলায় নিরঞ্জন বলে, 'কাল যে হুলিগান টাইপের ছোকরা দু'টো হানা দিয়েছিল, খানিকক্ষণ আগে আজও তারা এসেছে। বার বার তারা জানতে চাইছিল, মল্লিকা সান্যাল বলে কেউ আছে কিনা। আমার মনে হয় ওরা কিছু সন্দেহ করেছে।'

রুদ্ধশ্বাসে হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি ওদের কী বললেন?'

'কাল যা বলেছি আজও তাই বললাম।'

'ধন্যবাদ।'

'কিন্তু স্যার, আমি খবর পেয়েছি ওই হুলিগান দু'টো একটা নোটোরিয়াস গ্যাংয়ের লোক। আমি না হয় আপনার গেস্টের ব্যাপারটা গোপন রাখলাম। কিন্তু এই হোটেলে বয়, বেয়ারা, ফ্লোর অ্যাটেনডাণ্ট, কুক—সব মিলিয়ে ষাট জন কাজ করে। তাদের কারুর কাছ থেকে যদি কোনোভাবে খবরটা লীক হয়ে যায়, আই অ্যাম ফিনিশড।'

হিরণ্ময় কী উত্তর দেবেন, ভেবে পান না। নিরঞ্জন যা বলেছে তা খুবই দুশ্চিন্তার বিষয়। তাঁর জন্য কেনই বা সে এত বড় ঝুঁকি নেবে?

নিরঞ্জন এবার বলে, 'একটা কথা বলব?'

'কী?'

'আপনার গেস্ট যখন এসেই পড়েছেন, আর দুটো দিন উনি থাকুন। তারপর কিন্তু অন্য জায়গায় ও'র শেলটারের ব্যবস্থা করতে হবে।'

মাত্র দু'দিনের ভেতর মল্লিদের সমস্যার সমাধান করে দেওয়া সম্ভব হবে কিনা, সে সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিত নন হিরণ্ময়। কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে। অন্তত মল্লির জন্য একটা নিরাপদ আশ্রয় কি খুঁজে বার করা যাবে না? হিরণ্ময় বলেন, ঠিক আছে। আপনার কথা আমার মনে থাকবে।'

ম্যানেজারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে লিফটে করে ওপরে উঠে

আসেন হিরণ্ময়। মল্লি তাঁর স্যুইটে উৎকণ্ঠিতের মতো বসে ছিল। তাঁকে দেখে জোরে শ্বাস টেনে বলে, 'আপনার এত দেরি হল?'

একটা সোফায় বসতে বসতে হিরণ্ময় বলেন, 'হাসপাতালে গিয়ে সমীরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দু ঘণ্টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেছে, টের পাইনি।'

'সমীর কেমন আছে?'

ভাল। তবে আরো কয়েকদিন ওকে হাসপাতালে থাকতে হবে।'

'আপনি কে, ও কি জানতে পেরেছে?'

'হ্যাঁ। তবে আমার কথা সমীর এখন কাউকে বলবে না।' সমীরের সঙ্গে তাঁর যা আলোচনা হয়েছে সব জানিয়ে হিরণ্ময় শাড়ি-জামার প্যাকেটটা মল্লিকে দিতে দিতে বলেন, 'তোমার জন্যে এগুলো নিয়ে এলাম। জামার মাপ তো জানি না, আন্দাজে কিনতে হয়েছে। জানি না, তোমার পছন্দ হবে কিনা। তবে টেম্পোরারিলি কাজ চলে যাবে আশা করি। যাও, স্নান সেরে একখানা নতুন শাড়ি পরে এস। আমি লাঞ্চ দিতে বলে দিচ্ছি।'

মল্লি ওঠে না। ছেলেবেলার কথা তার মনে নেই। জ্ঞান হবার পরি এই প্রথম বাবার কাছ থেকে সে কিছু পেল। তার বুকের ভেতর কত যে ঢেউ ওঠে। জামাকাপড়ের প্যাকেটটা দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বালিকার মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

মল্লির আবেগ হিরণ্ময়ের মধ্যেও চারিয়ে গিয়েছিল। মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আবছা গলায় বলেন, 'কাঁদে না মা, কাঁদে না। যাও, স্নান সেরে এস।'

মল্লি যায় না, আরো কিছুক্ষণ বসে থাকে। দু'চোখ বেয়ে অবিরাম জলের ধারা নেমে আসতে থাকে তার। একসময় কান্নাটা থিতিয়ে এলে চোখ মুছে, নিঃশব্দে পাশের কামরায় চলে যায়।

আধঘণ্টা বাদে ফের যখন মল্লি হিরণ্ময়ের স্যুইটে আসে, তার স্নান হয়ে গেছে। পরনে সাদা খোলের ওপর ছোট ছোট ময়ূরের নকশা-করা নতুন শাড়ি আর হাতায় রঙিন কারুকাজ-করা ব্লাউজ।

ঘন চুলের রাশি পিঠময় ছড়ানো। মল্লি এমনিতেই দারুণ সুন্দর। এই মুহূর্তে তাকে জলে-ধোওয়া সজীব কোনো ফুলের মতো মনে হচ্ছে।

মুগ্ধ চোখে মল্লির দিকে তাকিয়ে থাকেন হিরণ্ময়। এই মেয়েটি, এই সৌন্দর্যের প্রতিমা যে তাঁর নিজেরই সৃষ্টি সেটা ভেবে হৃৎপিন্ডে শিহরণ অনুভব করেন। বলেন, 'বসো।'

মল্লি তক্ষুণি বসে না, ড্রেসিং টেবলের ওপর থেকে দুটো ট্যাবলেট আর ক্যাপসুল এবং এক গেলাস জল এনে হিরণ্ময় যেখানে বসে আছেন তার পাশের ছোট একটা টেবলে সাজিয়ে রেখে মুখোমুখি বসে।

তিনি কখন কী ওষুধ খান মল্লিকে একবার মাত্র বলে দিয়ে ছিলেন হিরণ্ময়, কিন্তু মল্লি সব মনে করে রেখেছে। যে মেয়েকে তেইশ বছর ভুলে ছিলেন তার কিন্তু তাঁর প্রতি সজাগ দৃষ্টি। মল্লির এই সেবাটুকু বড় ভাল লাগে হিরণ্ময়ের। তবে একটা ব্যাপার তিনি লক্ষ করেছেন, এখন পর্যন্ত মেয়েটা একবারও বাবা বলে নি। সে কি অনভ্যাসের কারণে? না কি বাবা বললে তিনি খুশি হবেন না, এই আশঙ্কায়? বোকা মেয়ে, যার একটি ফোন পেয়ে এতদূরে তিনি দৌড়ে এসেছেন তার মুখে বাবা ডাকটি শুনলে তিনি যে কতটা তৃপ্ত হবেন তা কি সে বোঝে না? মল্লি কখন বাবা বলে তার জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে থাকবেন।

আগেই রুম সারভিসকে লাঞ্চ দেবার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন হিরণ্ময়। একটা বয় খাবার দিয়ে যায়।

ছোট বড় নানা আকারের প্লেটে খাদ্যবস্তুগুলো সাজিয়ে প্রথমে হিরণ্ময়কে দিয়ে নিজেও খেতে বসে মল্লি। কাল রাতেই সে বুঝেছে হিরণ্ময়কে খাইয়ে সে যদি পরে খাওয়ার কথা বলে তিনি রাজী হবেন না।

খেতে খেতে বার বার সমীরের কথা উঠছিল। সে সুস্থ হবার পর কী করে মনোহরের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা হবে, শুরু করা হবে আন্দোলন—এসব নিয়ে প্রায় একতরফা বলে যাচ্ছিলেন হিরণ্ময়। হঠাৎ তিনি লক্ষ করেন, মল্লি কিছুই যেন শুনছে না, অন্যমনস্কের মতো ভাত নাড়াচাড়া করছে।

হিরণ্ময় বলেন, 'তোমাকে ভীষণ চিন্তিত দেখছি। কী হয়েছে?'

চমকে মুখ তুলে ব্যাকুলভাবে মল্লি বলে, 'আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি।'

হিরণ্ময় কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থাকেন। তারপর বলেন, 'কী অন্যায়?'

'মাকে ফোন করেছিলাম।'

'ভালই করেছ।'

'কিন্তু—' বলতে বলতে দ্বিধান্বিতভাবে থেমে যায় মল্লি।

হিরণ্ময় বলেন, 'কিন্তু কী?'

মুখ নামিয়ে মল্লি বলে, 'মা বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগল আমি কোথায় আছি। তাই—' কথাটা শেষ না করে সে থেমে যায়।

হিরণ্ময় কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, 'এখানকার কথা নিশ্চয়ই বলে দিয়েছ, তাই তো?'

আস্তে মাথা হেলিয়ে মল্লি জানায়—বলেছে।

'আশা করি এটাও বলেছ, এখানকার কথা কাউকে যেন সে না জানায়।'

'বলেছি।' অত্যন্ত আকুল হয়ে মল্লি বলতে থাকে, 'মরে গেলেও মা কাউকে জানাবে না।'

হিরণ্ময় ভাবেন, কাল মল্লি চলে আসার পর বিজলীর ওপর কতটা অত্যাচার চালিয়েছে মনোহর? জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে যান। একদিন যে তাঁকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল সেই দুশ্চরিত্র মেয়েমানুষটি সম্পর্কে কোনোরকম কৌতূহল থাকার কথা নয় তাঁর। তবু কেন যেন ভেতরে ভেতরে এক ধরনের চাঞ্চল্য অনুভব করছেন। তবে কি নষ্ট প্রাক্তন স্ত্রীর প্রতি অসীম ঘৃণার পাশাপাশি সঙ্গোপন একটু দুর্বলতাও থেকে গেছে?

মল্লি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি রাগ করলেন না তো?'

ম্লান হাসেন হিরণ্ময়, 'না—'

কী ভেবে ফের ধীরে ধীরে মুখ তুলে মল্লি আবছা গলায়

বলে, 'মা বড় দুঃখী। জ্ঞান হবার পর থেকে দেখছি ওই বদমাস লোকটা মাকে কষ্ট দিয়ে আসছে। প্রায়ই মার গায়ে হাত তোলে। কাল আমি পালিয়ে আসার পর খুব মারধর করেছে।'

বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে আসছিল হিরণ্ময়ের। বিজলী সম্পর্কে তিনি যা জানতে চাইছিলেন, জানা হয়ে গেছে। আর খেতে ইচ্ছে করছিল না। তিনি যে বিচলিত হয়েছেন, যাতে তা মল্লির চোখে ধরা না পড়ে তাই একরকম জোর করেই খাওয়া শেষ করে বেসিন থেকে আঁচিয়ে আসেন।

মল্লিও দ্রুত খেয়ে এঁটো প্লেটে ট্রে'তে তুলে মেঝের একধারে নামিয়ে রেখে হাতমুখ ধুয়ে আসে।

হিরণ্ময় বলেন, 'দুপুরে খাওয়ার পর আমি একটু শুই। তুমিও তোমার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর—'

হিরণ্ময়ের কথা শেষ হতে না হতেই দরজার কাছে পায়ের শব্দ শোনা যায়। চমকে হিরণ্ময় সেদিকে তাকান। আর তাকিয়েই হৃৎপিন্ডটা পলকের জন্য থমকে গিয়ে প্রবল গতিতে ওঠানামা করতে থাকে। প্রচন্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাতে তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব তোলপাড় হয়ে যায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বিজলী।

কতকাল পরে বিজলীকে দেখছেন হিরণ্ময়? মনে হয় যেন জন্মান্তর। কিন্তু এ কোন বিজলী? রৌদ্রঝলকেয় মতো তার সেই রং জ্বলে তামাটে হয়ে গেছে। সমস্ত চেহারা ভেঙে চুরমার। চোখের নিচে চিরস্থায়ী কালচে ছোপ পড়েছে। তাকে ঘিরে অসীম ক্লান্তি। মনোহর দীর্ঘকাল যুদ্ধ করে, সে ধ্বংসের শেষ মাথায় এসে পৌঁছেছে।

বিজলীকে দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল মল্লি। মা যে এই হোটেলে চলে আসবে, ভাবতে পারে নি সে। বিমূঢ়ের মতো বলে, 'মা, তুমি!'

মল্লির কথা যেন শুনতে পায় না বিজলী। হাঁটু মুড়ে দরজার কাছে মাথা ঠেকিয়ে সে হিরণ্ময়ের উদ্দেশে প্রণাম করে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নতমুখে বলে, 'আমি মহাপাপ করেছি। ভেবেছিলাম, এ মুখ তোমাকে দেখাবো না। তবু যে এলাম তা মল্লির

জন্যে।' কথা বলতে বলতে তার শরীর ভীষণ কাঁপছিল, সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরও। দু চোখ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অবিরল জলও ঝরে যাচ্ছে।

হিরণ্ময় কী বলবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না। বিভ্রান্তের মতো তিনি শুধু তাকিয়ে থাকেন।

কান্না জড়ানো ঝাপসা গলায় বিজলী বলে, 'আমি জানি মল্লির ফোন পেয়ে তুমি আনন্দপুরে এসেছ। কিন্তু এখানে বেশিদিন থাকা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি চলে যাবার পর ওর কী হবে?'

হিরণ্ময় বলেন, 'কী হবে বলতে?'

বিজলী যা উত্তর দেয় তা এইরকম। মল্লি যেভাবে মনোহর রক্ষিতের বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে, তাতে তার পক্ষে সেখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব না। এই শহরে কোথাও যে লুকিয়ে থাকবে তারও উপায় নেই। মনোহরের লোকেরা তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, পেলে শেষ করে ছাড়বে।

মেয়ের জন্য বিজলীর দুশ্চিন্তা আর ব্যাকুলতা যে খুবই আন্তরিক সেটা বুঝতে পারছিলেন হিরণ্ময়। সে যা বলছে তার প্রতিটি বর্ণ সঠিক। মনোহরের বন্দুকবাজেরা এই হোটেলেও যে মল্লির জন্য হানা দিয়েছিল তা তিনি নিরঞ্জনের কাছে শুনেছেন। সত্যিই তো, তিনি এখান থেকে চলে যাবার পর কী হবে মল্লির?

হিরণ্ময় কিছু বলার আগে বিজলী আবার বলে ওঠে, 'একটা কথা বলতে সাহস হয় না, যদি—'

হিরণ্ময় জিজ্ঞেস করেন, 'যদি কী?'

'মল্লিকে কি এখান থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া যায়?' বিজলী বলতে থাকে, 'মানে ও তো তোমার কাছে কোনো অন্যায় করে নি। মল্লি তোমার কাছে আশ্রয় পেলে আমার দুর্ভাবনা কাটত।'

হিরণ্ময় চমকে ওঠেন। মল্লিকে কলকাতায় নিয়ে গেলে আরেক ধরনের জটিলতা আর অস্বস্তির সৃষ্টি হবে, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। কেননা রমলা হিরণ্ময়ের জীবন থেকে বিজলীদের

মুছে ফেলতেই চেয়েছেন। মল্লিকে দেখলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন।

হিরণ্ময় দিশেহারা হয়ে পড়েন। একদিকে মল্লির নিরাপত্তা, আরেক দিকে তাকে কলকাতায় নিয়ে গেলে সাংসারিক বিপর্যয়ের আশংকা। কী করবেন তিনি ভেবে উঠতে পারেন না।

বিজলী তাঁর সমস্যা বুঝতে পারছিল। সে বলে, 'ওকে কলকাতায় নিয়ে তুললে খুবই অশান্তি হবে। তবু এছাড়া আমি আর কোনো রাস্তাই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় হিরণ্ময় বলেন, 'কিন্তু সমীর ইনজিওরড হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে। মল্লি কি তাকে ছেড়ে কলকাতায় যেতে চাইবে?'

সমীরের সঙ্গে মল্লির সম্পর্কটা কী, বিজলী নিশ্চয়ই তা জানে। এই মুহূর্তে সমীরের কথা তার মাথায় ছিল না, নিজের মেয়ের নিরাপত্তার ব্যাপারটাই তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে বিজলী। তারপর মল্লির দিকে তাকিয়ে বলে, 'কি রে, কী করবি?'

মুখ নামিয়ে মল্লি আধফোটা গলায় বলে, 'আমাকে এখন আনন্দপুরেই থাকতে হবে।'

বিজলী কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই হিরণ্ময় বলে ওঠেন, 'আপাতত ওসব কথা থাক। আমি তো আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছি না। ভেবেচিন্তে কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

হিরণ্ময় যখন মল্লির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাববেন বলছেন তখন খানিকটা যেন ভরসাই পায় বিজলী। দরজার কাছে ফের মাথা ঠেকিয়ে হিরণ্ময়কে প্রণাম জানিয়ে ঝাপসা গলায় বলে, 'আমি এবার যাই। লুকিয়ে এখানে এসেছি। এক্ষুণি ফেরা দরকার।'

বিজলী চলে যায়। বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন হিরণ্ময়। সে কেমন আছে, তিনি তা জানেন। মল্লি ও বাড়ি ছাড়ার পর বিজলীর ভবিষ্যৎ কী হবে, তারও নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে কিনা —এ সব কিছুই জানা হল না।

বার

এরপর দু'টো দিন কেটে যায়।

এই দু'দিন মল্লিককে মুহূর্তের জন্যও হোটেল থেকে বেরুতে দেন নি হিরণ্ময়, তবে নিজে বেরিয়েছেন। সকাল বিকেল দু বেলাই হাসপাতালে গিয়ে সমীরকে দেখে তো এসেছেনই, তার সঙ্গে মনোহরের বিরুদ্ধে জনমত তৈরির ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।

হিরণ্ময়কে আন্দোলনের সময় সঙ্গে পাবে, তাই উৎসাহে টগবগ করে ফুটছে সমীর। ডাক্তাররা দিন চারেক তাকে হাসপাতালে আটকে রাখবে, নইলে এখনই সে সারা আনন্দপুর জুড়ে তুমুল হইচই শুরু করে দিত।

এই দু'দিন হাসপাতালে মনোজ, অরুণ, অলক এবং সমীরের অ্যান্টি-ড্রাগ এবং অ্যান্টি-মনোহর মুভমেন্টের অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও দেখা হয়েছে। তারা অবশ্য সকালের দিকে আসে নি, দল বেঁধে সমীরকে দেখতে বিকেলে এসেছে। ওরা জানিয়েছে মনোহরের মাস্তান বাহিনী তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শাসিয়ে এসেছে, প্রত্যেককে দেখে নেওয়া হবে। ফের যদি কেউ মিছিল টিছিল বার করে লাশ ফেলে দেওয়া হবে। তবে আপাতত মাস্তানরা খুঁজে বেড়াচ্ছে মল্লিককে।

অবশ্য মল্লি কোথায় উধাও হয়ে গেছে, মনোজরা জানে না। সেজন্য তারা খুবই উদ্বিগ্ন। মল্লি যে হোটেলে আছে, হিরণ্ময় বা সমীর ওদের জানায় নি। সেটা মল্লির নিরাপত্তার কারণেই। জানালে এ কান সে কান হয়ে সেটা মনোহরের কাছে যে পেঁৗছে যাবে না, এমন গ্যারান্টি নেই।

হাসপাতালে আরো একবার দেখা হয়েছে দিবাকর সামন্তর সঙ্গে। লোকটা সেই পুরনো প্রশ্নটাই ফের করেছে, 'আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি বলুন তো ?'

সঠিক উত্তর না দিয়ে হিরণ্ময় বলেছেন, 'কোথাও দেখে থাকতে পারেন। কিংবা আমার মতো কাউকে দেখেছেন। তার সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলছেন।'

'হয়তো তাই হবে।' হিরণ্ময়ের কথা মোটামুটি মেনে নিলেও দিবাকরের সংশয় যে পুরোপুরি কাটে নি সেটা তার চোখমুখ দেখে বোঝা গেছে।

আজ সকালে ব্যালকনিতে বসে সূর্যোদয় দেখার পরও তিনি ওঠেন নি, সেখানেই বসে আছেন। এর মধ্যে মল্লি তাঁকে চা খাইয়ে তার ঘরে চলে চলে গেছে।

রাস্তায় এখন বেশ লোকজন, রিকশা টিকশা দেখা যাচ্ছে। শহরের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে।

হঠাৎ হিরণ্ময়ের চোখে পড়ে, একটা কালো রঙের ঢাউস পুলিশ ভ্যান তাঁদের হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল। ওদিকটায় শেড থাকায় ভ্যানটা থেকে কে বা কারা নামল, দেখা যাচ্ছে না। যারাই নামুক, মাথাব্যথা নেই হিরণ্ময়ের। চোখ সরিয়ে নিয়ে তিনি ফের রাস্তার দৃশ্যাবলী দেখতে থাকেন।

কিন্তু বেশিক্ষণ ব্যালকনিতে বসে থাকা গেল না। মিনিট পাঁচ সাত পর নিরঞ্জনের সঙ্গে ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা থানার সেই ওসি তাঁর স্যুইটে এসে হাজির।

প্রথমটা অবাক হয়ে যান হিরণ্ময়। তাঁর কাছে পুলিশের কী দরকার থাকতে পারে? তিনি ব্যালকনি থেকে উঠে ওদের কাছে চলে আসেন। সতর্কভাবে ওসি'কে লক্ষ করতে করতে বলেন, 'আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

ওসি হাতজোড় করে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলেন, 'স্যার, কাল বিকেল থেকে আপনার খোঁজে শহরের সব হোটেল আর ধর্মশালা তোলপাড় করে ফেলেছি। শেষ পর্যন্ত এখানে এসে আপনাকে পাওয়া গেল।'

'আমাকে খুঁজছেন কেন?'

এবার ওসি যা জানান, সংক্ষেপে এই রকম। কাল বিকেলে কলকাতার পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স থেকে খবর এসেছে, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ হিরণ্ময় সান্যালকে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি আনন্দপুরে এসেছেন কিনা, চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর খোঁজ করে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। যাতে চিনতে পারা যায় সে জন্য হিরণ্ময়ের

একটা ফোটোও পাঠানো হয়েছে। ফোটো আর নির্দেশ শুধু আনন্দপুরেই নয়, পশ্চিম বাংলার সমস্ত থানাতেই পেঁছে দেওয়া হয়েছে।

হিরণ্ময় বুঝতে পারেন, রমলা নিশ্চয়ই পুলিশকে তাঁর খবরটা জানিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তার অ্যাকশন করেছে।

ওসি বলেন, 'স্যার, আপনি ক'দিন আগে থানায় গিয়েছিলেন। আপনার মুখটা আবছাভাবে মনে ছিল। হেড কোয়ার্টার্স থেকে যে ফোটো পাঠিয়েছে, মনে মনে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম হুবহু এক। তারপর কাজ আরম্ভ করলাম। কিন্তু এখানে এসে হোটেল রেজিস্টারে 'ললিত সান্যাল' দেখে ধোঁকা লাগল। অবশ্য নিরঞ্জন-বাবুকে আপনার ফোটো দেখিয়ে চাপ দিতেই উনি স্বীকার করলেন, আপনি এখানে আছেন। অবশ্য আপনি যে হিরণ্ময় সান্যাল উনি তা জানতেন না।' একটু থেমে কুন্ঠিত ভঙ্গিতে আবার বলেন, 'যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

হিরণ্ময় বলেন, 'আমি নিজের নামে স্যুইট না নিয়ে অন্য নামে নিলাম কেন—এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা আপনার হায়ার অথরিটিকে জানাব। আর জানাব, আমি একটা বোমার কেসের ডায়েরি করতে থানায় গিয়েছিলাম। আপনি নিতে চান নি।'

ওসি চকিত হয়ে ওঠেন, করুণ মুখে বলেন, 'স্যার, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। কেসটা যে গুরুতর, আমি বুঝতে পারি নি।'

হিরণ্ময় কঠোর স্বরে বলেন, 'আপনার আর কিছু বলার আছে?'

'না, মানে—' ওসি ঢোক গিলতে গিলতে বলেন।

কিছু বলতে গিয়ে থেমে যান হিরণ্ময়। ড্রাগের চোরাচালান, মনোহর রক্ষিতের মস্তান বাহিনী, লোকাল থানার সঙ্গে মনোহরের আঁতাত, সমীর, মল্লিল—সব মিলিয়ে যে জটিল সমস্যাটা ক'দিন ধরে তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছিল, বিদ্যুৎচমকের মতো তার একটা সমাধান তাঁর মাথায় এসে যায়।

হিরণ্ময় ওসি'কে বলেন, 'আপনার কাজ হয়ে গেলে, এখন যেতে পারেন।'

ওসি বলেন, 'আপনি অনুমতি দিলে হোটেলের সামনে দু'জন কনস্টেবল রেখে যাব।'

হিরণ্ময় বুঝতে পারেন, তিনি যাতে এখান থেকে পালিয়ে যেতে না পারেন সে জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পুলিশ পোস্ট করতে চাইছেন ওসি। তিনি বলেন, 'আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন।'

ওসি চলে যান।

নিরঞ্জন এতক্ষণ চুপচাপ সব শুনে যাচ্ছিল। এবার সে বলে, 'স্যার, আপনি এত বড় একজন মানুষ। আব—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে হিরণ্ময় বলেন, 'ও সব কথা থাক। আপনি আমার একটা কাজ করে দিতে পারেন?',

শশব্যস্তে নিরঞ্জন বলে, 'নিশ্চয়ই স্যার। বলুন কী করব—'

'কলকাতায় লালবাজারে ফোন করে দেখুন তো অনুপম ঘোষ নামে কোনো অফিসারকে পান কিনা। যদি পাওয়া যায়, লাইনটা আমাকে দেবেন।'

'আচ্ছা সার—' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় নিরঞ্জন। 'মিনিট কুড়ি বাদে নিচে থেকে ফোন করে জানায়, 'অনুপমবাবুকে পাওয়া গেছে। তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।'

একটু পরেই অনুপমের গলা ভেসে আসে, 'স্যার, আপনি সুস্থ আছেন তো?'

হিরণ্ময় বলেন, 'হ্যাঁ, আছি। পারফেক্টলি অলরাইট।'

'ছ' দিন আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত যখন ফিরলেন না, বৌদি আমাকে ফোন করেছিলেন। তারপর ক্যালকাটা পুলিশ, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ আপনার খোঁজে নেমে পড়ে। দুশ্চিন্তায় টেনসানে বৌদি, টিপু আর পলার যে কী অবস্থা হয়েছে, বলে বোঝাতে পারব না। খবরের কাগজওয়ালারা কিভাবে যেন যেন টের পেয়ে দিনে পঞ্চাশ বার করে আমাদের ফোন করছে, আপনাদের বাড়িতেও চার পাঁচ বার করে হানা দিচ্ছে। দিল্লির টপ লেভেল থেকেও আপনাকে পাওয়া গেল কিনা খবর দিচ্ছে।

এরকম একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে হিরণ্ময় আগেই আন্দাজ করেছিলেন। আবছাভাবে ভেবেছিলেন মল্লির সঙ্গে দেখা করে তার সমস্যার একটা সুরাহা করে দু-একদিনের ভেতর কলকাতায় ফিরতে পারবেন। কিন্তু এখানে যেভাবে জড়িয়ে পড়েছেন তাতে সব ফেলে চলে যাওয়া যায় না।

হিরণ্ময় কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই অনুপম জিজ্ঞেস করে, 'হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে ওভাবে চলে গেলেন কেন?'

হিরণ্ময় বলেন, 'ফোনে কিছু বলব না। এখানে একটা বড় প্রবলেমের মধ্যে আটকে গেছি। সেটা খানিকটা আমার পার্সোনাল, অন্য দিকে আমাদের দেশেরও। তোমার আর সেই সঙ্গে ক'জন টপ্ পুলিশ অফিসারের এখানে আসা খুব জরুরি। এলে সব জানতে পারবে।'

'পুলিশ ডিপার্টমেন্ট ঠিকই করে রেখেছে, আপনার খবর পাওয়ামাত্র একটা হাই লেভেল টিম পাঠিয়ে দেবে, সেই দলে আমিও একরকম জোর করে ঢুকে গেছি। কিন্তু আপনি এখন কোথায় আছেন, সেটাই জানা হয় নি।

'আনন্দপুরে, 'হোটেল স্কাইলার্কে'-এ'।'

'আনন্দপুর—মানে নর্থ বেঙ্গলে?'

'হ্যাঁ।'

'কাল সকালে আমরা ওখানে পৌঁছে যাব।'

'আরেকটা কথা—'

'বলুন।'

'তোমার বৌদিকে আমার খবর দিয়ে ব'লো দুর্ভাবনার কারণ নেই। তবে সমস্যা টমস্যার কথা বলবে না।'

'আচ্ছা।'

'এখন তা হলে রাখি।' কথা শেষ করে আস্তে আস্তে ফোন নামিয়ে রাখেন হিরণ্ময়।

তের

পরদিন সকালে দুটো অ্যামবাসাডরে বোঝাই হয়ে অনুপম, একজন ডি. আই. জি, আনন্দপুর অঞ্চলের এস. পি, ডি. এস. পি এবং আরো দু'জন বড় অফিসার 'হোটেল স্কাইলার্ক'-এ পেঁছে যান।

একটানা মোটর জার্নি'র পর সবাই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। নিরঞ্জন দুটো ফাঁকা স্যুইট খুলে তাঁদের বিশ্রাম এবং ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করে দেয়। চা-টা খেয়ে ও'রা আসেন হিরণ্ময়ের কাছে।

কেউ কোনো প্রশ্ন করার আগে হিরণ্ময়ই শুরু করেন, 'আপনারা নিশ্চয়ই প্রথমে জানতে চাইবেন কেন আমি এখানে চলে এসেছি।'

সবাই নিঃশব্দে মাথা নাড়েন।

'একটু বসুন, আমি আসছি।' বলে পাশের ঘর থেকে মল্লিকে নিয়ে আসেন হিরণ্ময়। তাকে দেখিয়ে বলেন, 'এ আমার বড় মেয়ে মল্লি। এর জন্যই আমাকে আসতে হয়েছে।'

পুলিশ অফিসাররা হকচকিয়ে গিয়ে একজন আরেক জনের মুখের দিকে তাকাতে থাকেন।

হিরণ্ময় সকলের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে করতে বলেন, 'আপনারা হয়তো জানেন আমি একবারই বিয়ে করেছি। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। এর আগেও আমার বিয়ে হয়েছিল, মল্লি আমার প্রথম স্ত্রীর সন্তান। অবশ্য সে বিয়ে টেকে নি, ডিভোর্স হয়ে যায়। যাই হোক, ক'দিন আগে এই আনন্দপুর থেকে মল্লি আমাকে ফোন করেছিল। আমার পক্ষে এখানে না এসে উপায় ছিল না।'

এরপর মল্লি কেন তাঁকে ফোন করেছিল, এখানে আসার পর তিনি কোন গভীর সমস্যায় জড়িয়ে গেছেন—সব কিছু ধীরে ধীরে বলে যান।

ডি. আই. জি বলেন, 'এখানে ড্রাগ চোরাচালানের একটা চক্র যে

রয়েছে সে খবর আমরা পেয়েছি। দেখি কী করা যায়। আপনাকে কিন্তু স্যার আজই আমাদের সঙ্গে কলকাতায় রওনা হতে হবে। চিফ মিনিস্টার তো বটেই, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের দিক থেকেও আমাদের ওপর ভীষণ প্রেসার আসছে।'

'কলকাতায় তো ফিরতেই হবে। তবে আমার কিছু শর্ত আছে।'

'কী করতে হবে বলুন।'

'এক, ড্রাগ চোরাচালানের কিংপিন মনোহর রক্ষিতের বিরুদ্ধে কড়া স্টেপ নিতে হবে। দুই, তার মাস্তান বাহিনীকে অ্যারেস্ট করতে হবে। আপনাদের এখানকার দারোগাটি খুবই কোরাপ্ট, তার মদতে ড্রাগের চোরাচালান এখানে রম রম করে চলছে। এই লোকটাকে ইমিডিয়েটলি সাসপেন্ড করতে হবে। আর ড্রাগের এগেনস্টে যারা আন্দোলন শুরু করেছে তাদের প্রোটেকশানের ব্যবস্থা করতে হবে।'

ডি. আই. জি বলেন, 'আপনি যা যা বললেন সব করা হবে। আপনি এখান থেকে রওনা হবার আগেই কিছু কিছু জেনে যেতে পারবেন।'

'ধন্যবাদ।'

চোদ্দ

পুলিশ অ্যাকশান কী বস্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আনন্দপুর টের পেয়ে যায়। মনোহর রক্ষিতের মাস্তান বাহিনীকে ছেঁকে তুলে হাজতে পুরে দেওয়া হয়। মনোহরকে ধরা যায় নি, খুব সম্ভব পুলিশের গন্ধ পেয়ে বর্ডারের ওধারে উধাও হয়েছে। তবে তার বাড়ি এবং নানা গোপন আস্তানা থেকে দেড় কোটি টাকার ব্রাউন সুগার, গাঁজা এবং অন্যান্য ড্রাগ উদ্ধার করা গেছে। আনন্দপুর থানার ওসি'র সাসপেনসানের ব্যবস্থাও হয়েছে, কালকের ভেতর তাঁর হাতে অর্ডার পেঁৗছে যাবে।

বিকেলে ডি. আই. জি হিরণ্ময়কে বলেন, 'আশা করি আপনাকে

খানিকটা খুশি করতে পেরেছি। এবার তা হলে রওনা হওয়া যাক।'

হিরণ্ময় বলেন, 'হ্যাঁ, যাব। যাওয়ার পথে একবার এখানকার হাসপাতালে নামতে চাই।'

'নিশ্চয়ই।'

কিছুক্ষণ পর 'হোটেল স্কাইলার্ক' থেকে পর পর দুটো অ্যামবাসাডর বেরিয়ে পড়ে। প্রথম গাড়িটায় রয়েছে মল্লি, হিরণ্ময়, ডি. আই. জি, অনুপম এবং আরেকজন অফিসার। পেছনের গাড়িটায় বাকি সবাই।

অফিসারদের অপেক্ষা করতে বলে মল্লিকে সঙ্গে করে জেনারেল ওয়ার্ডে সমীরের কাছে চলে আসেন হিরণ্ময়।

সমীরের বেডের চারপাশে এখন বেশ ভিড়। তার মা তো আছেনই, তা ছাড়া মনোজ অরুণ গোপা অলক ইত্যাদি আরো অনেকে তাকে দেখতে এসেছে।

মল্লির ব্যাপারে সমীর ছাড়া অন্য ছেলেমেয়েরা, এমন কি সমীরের মা পর্যন্ত ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিল। কেননা মল্লি কোথায় আছে, সমীর ছাড়া আর কাউকে জানান নি হিরণ্ময়।

মল্লিকে দেখে সবাই যতটা খুশি, তার চেয়ে অনেক বেশি অবাক। ছেলেমেয়েরা চারিদিক থেকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, 'কোথায় ছিলে মল্লিদি? কোথায় ছিলে?'

হিরণ্ময় হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'আমার কাছে। 'হোটেল স্কাইলার্ক'-এ ওকে লুকিয়ে রেখেছিলাম।'

মনোজ বলে, 'রোজ আপনার সঙ্গে হাসপাতালে দেখা হয়েছে। কই, একবারও তো ওর কথা বলেন নি।'

হিরণ্ময় বলেন, 'তখন বলার উপায় ছিল না। জানাজানি হলে ওর ক্ষতি হয়ে যেত।'

একটু চুপ।

তারপর হিরণ্ময় আবার বলেন, 'তামরা কি শুনেছ মনোহর রক্ষিতদের বিরুদ্ধে পুলিশ অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে?'

সবাই একসঙ্গে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি। মনোহরের মস্তানদের ছেঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে হাজতে পোরা হয়েছে। কিভাবে

হল কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'মল্লির কাছ থেকে শুনে নিও।' হিরণ্ময় বলতে থাকেন 'তোমাদের সবার প্রোটেকসানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেউ তোমাদের গায়ে আঙুল ঠেকাতে সাহস করবে না। অ্যাডমিনিস্ট্রেসান মনোহরের বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছে। তোমরা নিশ্চিন্তে থাকতে পার। এবার অন্য একটা কথা বলব। নিশ্চয়ই তোমরা জানতে চাইছ আমি কে?'

ছেলেমেয়েরা উৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁ,মানে—'

'হাতে বেশি সময় নেই। মল্লি আর সমীর তোমাদের সব জানিয়ে দেবে। শুধু এটুকু বলছি মল্লি আমার মেয়ে, নিজের সন্তান।' বলে মল্লিকে সঙ্গে করে সমীরের মায়ের কাছে নিয়ে আসেন, বলেন, 'এই মেয়েটিকে আপনার হাতে দিয়ে গেলাম। এখন থেকে ও আপনার কাছে থাকবে। বিয়ে ঠিক হলে আবার আমি আনন্দপুরে আসব।' মল্লিকে বলেন, 'মনোহর রক্ষিত বর্ডারের ওধারে পালিয়ে গেছে। ফিরে এসে তোমার মায়ের ওপর অত্যাচার করতে পারে। আমি পুলিশকে বলে দেবো মনোহর কিছু করলে যেন তাকে শায়েস্তা করা হয়।'

হিরণ্ময় আর দাঁড়ান না। কিন্তু সবে কয়েক পা এগিয়েছেন, মল্লি দৌড়ে এসে তাঁর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, বালিকার মতো ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, 'বাবা—বাবা—বাবা—'

কান্নার মতো সংক্রামক ব্যাপার আর কিছু নেই। মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ধরা গলায় হিরণ্ময় বলেন, 'কাঁদিস না মা, তুই যখনই ডাকবি আমি চলে আসব।' তাঁর দু চোখের প্রান্ত শির শির করতে থাকে। মনে হয় ভেতর থেকে চাপা একটা প্রস্রবণ ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

একসময় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ক্লান্ত পা ফেলে ফেলে হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে আসেন হিরণ্ময়। টের পাচ্ছিলেন, তাঁর দু' চোখ এতক্ষণে জলে ভরে গেছে।